৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

লেকচার: ০৮

টপিক:

বৈশ্বিক উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ: বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ (IMF), এডিবি (ADB), জি-৭, জি-৭৭, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ব্রিকস (BRICS), এনডিবি (NDB), এআইআইবি (AIIB), কোভিড-১৯ সময়কালীন অর্থনৈতিক মন্দা থেকে পুনরুদ্ধার, কিয়োটো প্রোটোকল, কনফারেন্স অফ পার্টিস (COP) ইত্যাদি।

আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান: আরসিইপি (RCEP), বিমসটেক (BIMSTEC), সার্ক (SAARC), আসিয়ান (ASEAN) ও ওআইসি (OIC), ন্যাটো (NATO), এপেক (APEC), জিসিসি (GCC) এবং ইইউ (EU), কোভিড -১৯ পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থা।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

বিশ্বব্যাংক

এক নজরে বিশ্বব্যাংক

প্রতিষ্ঠা	১৯৪৪ সালের জুলাই মাসের ব্রেটন উডস সম্মেলনের মাধ্যমে।
আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু	২৬ জুন, ১৯৪৬ সালে।
বর্তমান সদস্য সংখ্যা	১৮৯টি।
সদর দপ্তর	ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
বর্তমান প্রেসিডেন্ট	অজয় বাঙ্গা।
প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল	৫ বছর।
কার্যনির্বাহী পরিচালকমণ্ডলী	২৫ সদস্যবিশিষ্ট। ৫ জন নিযুক্ত হন সর্বাধিক চাঁদা প্রদানকারী পাঁচটি দেশ থেকে এবং বাকি ১৯ জন ১৯টি ভৌগোলিক গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, ব্রিটেন, ফ্রান্স সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন।
সর্বাধিক চাঁদা প্রদানকারী ৭টি দেশ	যুক্তরাষ্ট্র (১৫.৮৫%), জাপান (৬.৮৪%), চীন (৪.৪২%), জার্মানি (৪%), ফ্রান্স (৩.৭৫%), যুক্তরাজ্য (৩.৭৫%) ও ভারত (২.৯১%)।

বিশ্বব্যাংক

World Bank Group – এর অঙ্গ সংগঠন

নাম	প্রতিষ্ঠা	সদস্য	কাজ
WORLD BANK IBRD	২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৪ কার্যক্রম শুরু: ১৯৪৬ সালে	১৮৯	এ সংস্থা মধ্য ও নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে ঋণ প্রদান করে থাকে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা।
IFC International Finance Corporation WORLD BANK GROUP	২০ জুলাই, ১৯৫৬	১৮৬	এ সংস্থা উন্নয়নশীল দেশগুলোর বেসরকারি খাতে ঋণ প্রদান করে থাকে। প্রধান হলেন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট।
IDA International Development Association WORLD BANK GROUP	২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০	১৭৪	এ সংস্থা অতি দরিদ্র এবং যে সব দরিদ্র দেশ IBRD থেকে ঋণ পায় না সে সকল দেশগুলোকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে থাকে। তাই একে SOFT LOAN WINDOW বলে।

বিশ্বব্যাংক

নাম	প্রতিষ্ঠা	সদস্য	কাজ
ICSID INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES	১৪ অক্টোবর, ১৯৬৬	১৫৮	এ সংস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবিরোধ নিরসনে মধ্যস্থতা করে।
MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency	১২ এপ্রিল, ১৯৮৮	১৮২	এ সংস্থা উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে।

বিশ্বব্যাংক

বিশ্বব্যাংকের উদ্দেশ্য

- ✓ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সহায়তা প্রদান করা।
- ✓ উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থ সরবরাহ করা।
- দরিদ্র ও উন্নয়শীল দেশগুলোর দারিদ্র্য দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করা।

বিশ্বব্যাংকে চাঁদা প্রদানকারী ৭টি দেশ

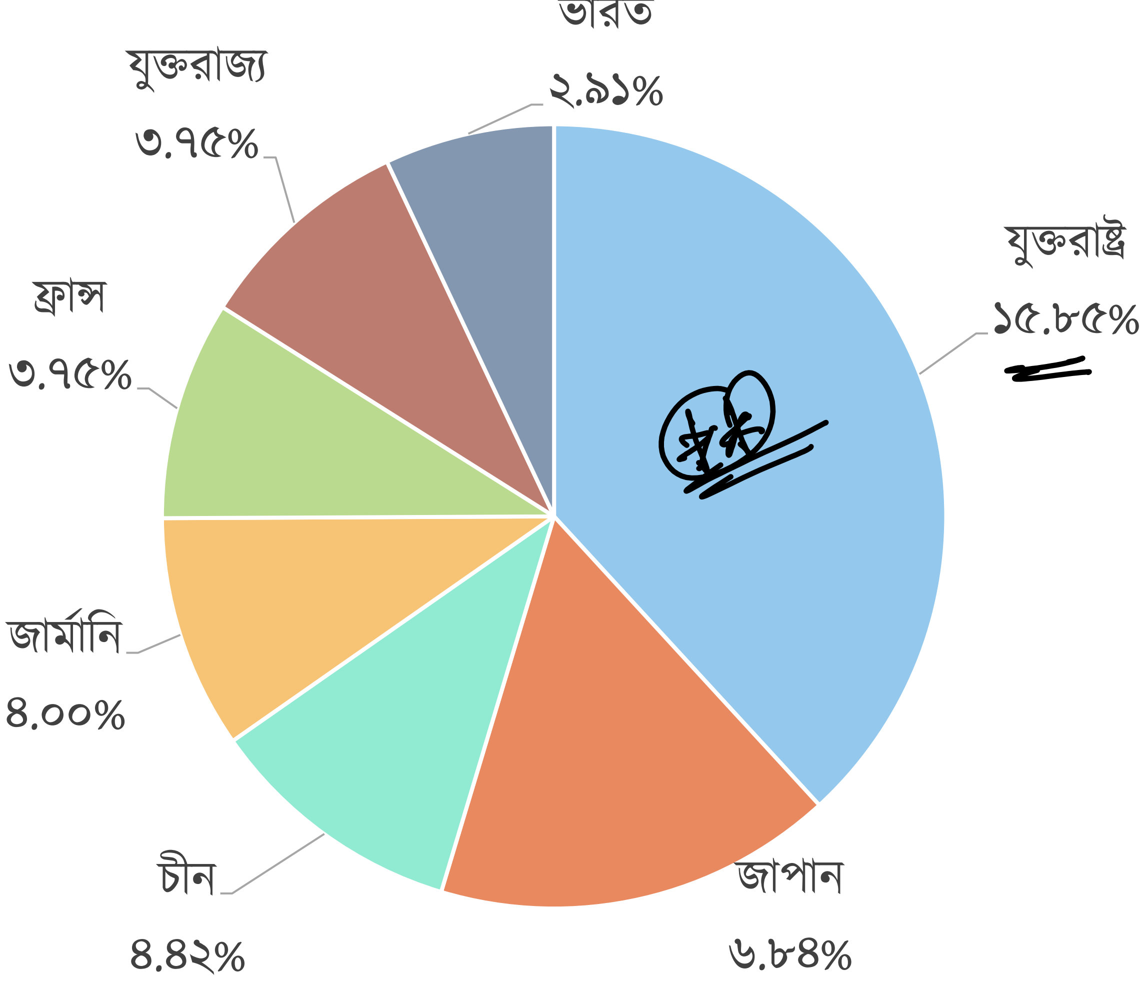

বিশ্বব্যাংক

বিশ্বব্যাংকের কার্যাবলি

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দীর্ঘমেয়াদি ভারসাম্য প্রদান এবং সদস্য দেশসমূহের লেনদেনে ভারসাম্য বজায় রেখে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান ও শ্রমের পরিবেশ উন্নত করা।
- সদস্য দেশসমূহের বিদেশি বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগ সম্প্রসারিত করা এবং বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের পুঁজি অংশীদারিত্ব বা তাদেরও বিনিয়োগের নিশ্চয়তা প্রদান করা।
- সদস্য দেশসমূহের পুঁজি বিনিয়োগের সুবিধা সৃষ্টি করে পুনর্গঠন ও উন্নয়নে সহায়তা করা।
- বিশ্বব্যাংক বিশেষ করে মনোযোগ দিচ্ছে সেই সব প্রকল্পগুলোতে যেগুলো উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র জনসাধারণের সরাসরি উপকারে আসে।
- ঋণ গ্রহীতা সদস্য রাষ্ট্রটি বিশ্বব্যাংককে দেখতে পায় কারিগরি সহযোগিতার একটি উৎস হিসেবে। কেননা, অধুনা এরা প্রচুর পরিমাণে কারিগরি ঋণ সুবিধাদি প্রদান করে থাকে। তাছাড়া বিশ্বব্যাংক ইউএনডিপি কর্তৃক কারিগরি সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের এজেন্সি হিসেবে কাজ করে। এসব প্রকল্পের মধ্যে কৃষি, পল্লি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কিত খাতগুলোকে প্রাধান্য দেয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা নিরীক্ষান্তে বিশ্বব্যাংক ইদানীং বেশি জোর দিচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নমূলক কারিগরি সহায়তা এবং ম্যাক্রো-ইকোনমিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে।

বিশ্বব্যাংক

ঋণদানের খাতসমূহ

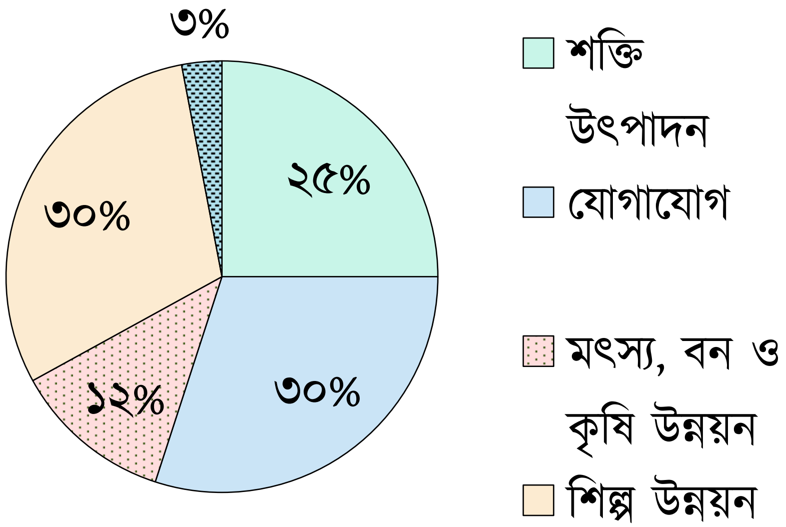

বিশ্বব্যাংকের ঋণ প্রদানের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- ✓ যে প্রকল্পের জন্য ঋণের আবেদন করা হয়েছে তার প্রকল্প প্রস্তাবনার যথার্থতা ও সুবিধাগুলো একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়ে থাকে।
- ✓ যে রাষ্ট্র ঋণ নেবে তার সে ঋণ ফেরত দেওয়ার যুক্তিসংগত সম্ভাবনা থাকতে হবে।
- ✓ ঋণ কেবল উৎপাদনমুখী উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়।
- ✓ বিশ্বব্যাংকের ঋণের মাধ্যমে কোনো প্রকল্পের পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য কেবল বৈদেশিক মুদ্রার আবশ্যকতাই পূরণ করা হয়।

বিশ্বব্যাংক

বিশ্বব্যাংকের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে শর্তাবলি

অর্থনৈতিক শর্তাবলি (Economic Conditions)

- **বেসরকারিকরণ:** বেসরকারিকরণের পাঁচটি আলাদা ধরন রয়েছে। যেমন: পানি খাত বেসরকারিকরণ, খনিজ সম্পদ বেসরকারিকরণ (প্রাকৃতিক গ্যাস), বিদ্যুৎ খাত বেসরকারিকরণ, কৃষিখাত বেসরকারিকরণ এবং বিবিধ।
- **বেসরকারিকরণ সংস্কার:** এ শর্তের অধীনে ঋণ গ্রহীতা রাষ্ট্রগুলোকে ক্ষেত্র বিশেষে তাদের বেসরকারিকরণ নীতিতে পরিবর্তন আনতে হয়।
- **বাণিজ্য উদারীকরণ:** এ শর্তের আওতাধীন বিষয়গুলো হলো : শুল্ক হ্রাস, শুল্ক কাঠামোতে পরিবর্তন, পণ্য ও সেবা খাতে নিয়ন্ত্রণ হ্রাস।
- **বাণিজ্য সংক্রান্ত অন্যান্য শর্ত:** বাণিজ্য বাধা দূর করা, বাজারভিত্তিক বিনিময় মূল্য এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা দূর করা।

বিশ্বব্যাংক

বিশ্বব্যাংকের ঋণ প্রদান নীতির সমালোচনা

বিশ্ব ব্যাংকের ঋণদান নীতির সমালোচনাও হয়ে থাকে। বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পরাশক্তি, বৃহৎ শক্তি, আঞ্চলিক পরাশক্তির প্রভাব বেশি থাকায় ঋণ প্রদান কার্যক্রমে তাদের স্বার্থই প্রায়শ প্রতিফলিত হয়। তাছাড়া বিশ্বব্যাংক কেবল প্রকল্পের বৈদেশিক মুদ্রার অংশের জন্য ঋণ প্রদান করে এ ঋণের অর্থ কেবল পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আমদানিকৃত কাঁচামাল ও সেবা ক্রয়ের পেছনে খরচ করতে হয়। বিশ্বব্যাংককে অনেক সময় হস্তক্ষেপকারী (Interventionist) হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। কারণ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের পলিসি সংস্কার বা কাঠামোগত এডজাস্টমেন্টের নামে প্রায়শই বিশ্বব্যাংক পরামর্শ দিয়ে থাকে। এর ফলে ঋণ গ্রহণকারী রাষ্ট্রের জনগণের স্বার্থ অনেক সময়ই রক্ষিত হয় না। পৃথিবীর ধনী রাষ্ট্রগুলো বিশ্বব্যাংককে টাকার জোগান দেয় সুদে খাটানোর জন্য। সেখানে টাকার অঙ্কে ভোটের হিসাব হয়। যে রাষ্ট্র সুদের ব্যবসার জন্য বিশ্ব ব্যাংকে এক কোটি ডলার দিল, তার এক ভোট যে দশ কোটি ডলার দিল তার দশ ভোট এ রকম হিসাব করা হয়। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশি অর্থ কেউ বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে সুদে খাটাতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র কাউকে সে সুযোগও দেয় না। ফলে বিশ্বব্যাংকের কর্তৃত্ব সবসময় থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। এর প্রেসিডেন্টকেও নিয়োগ দেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

বিশ্বব্যাংক

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের সদস্য পদ লাভ করে। সদস্য প্রাপ্তির পর থেকেই বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ প্রদান করে আসছে। দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে টানাপোড়েনের জেরে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অবকাঠামো প্রকল্প পদ্মা সেতু নির্মাণে অর্থায়ন থেকে সরে দাঁড়ায় বিশ্বব্যাংক। ২০১২ সালের ঐ ঘটনার পর তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশে উচ্চঝুঁকির বড় প্রকল্পে অর্থায়ন থেকে সরে আসতে শুরু করে সংস্থাটি। দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট জটিলতায় বাংলাদেশে অর্থায়ন কৌশলেও বড় পরিবর্তন আনে বিশ্বব্যাংক।

কৌশল বদলালেও অর্থায়ন কমেনি সংস্থাটির। অবকাঠামোর পরিবর্তে দেশের চিকিৎসা, শিক্ষা, মানব উন্নয়নমূলক বিভিন্ন সামাজিক খাতে অর্থায়ন করতে থাকে সংস্থাটি। ধীরে ধীরে বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে সম্পর্কের অস্বস্তিও কাটতে থাকে। সম্পর্কেরও উন্নয়ন হতে থাকে দুই পক্ষের মধ্যে। বর্তমানে প্রয়োজনের মুহূর্তে বাংলাদেশও ঋণের নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে দেখছে বিশ্বব্যাংককে।

বিশ্বব্যাংক

২০২১-২২ অর্থবছরে তৃতীয় সর্বোচ্চ উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশের জন্য প্রায় ১৬৭ কোটি ডলারের ঋণ সহায়তা ছাড় করেছে বিশ্বব্যাংক। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এরই মধ্যে বাংলাদেশের জন্য বেশ কয়েকটি ঋণ অনুমোদন দিয়েছে বিশ্বব্যাংকের বোর্ড। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা পৌনে দুই কোটি গরিব কৃষকের আয় বাড়াতে ১২ কোটি ডলার ঋণ সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে সংস্থাটি। আঞ্চলিক কানেক্টিভিটিতে বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশের জন্য ৭৫ কোটি ডলারের একটি ঋণ অনুমোদন করেছে বিশ্বব্যাংক। করোনা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলার পাশাপাশি দুর্যোগ ও রোগের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলাসহ ভবিষ্যৎ সংকট মোকাবিলায় আরও ৩০ কোটি ডলারের ঋণ দেয়া হচ্ছে বাংলাদেশকে। বিষয়টি নিয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের একটি চুক্তি হয়েছে। আগামী তিন অর্থবছরে বাজেট সহায়তা হিসেবে সংস্থাটির কাছে আরও ৭০ কোটি ডলার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর বাইরে সরকারও এখন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াতে বিশ্বব্যাংকের কাছে ১০০ কোটি ডলারের ঋণ সহায়তা চেয়েছে। সব মিলিয়ে সংস্থাটি এখন বাংলাদেশে নিজেদের সেরা সময়টি পার করছে।

বিশ্বব্যাংক

'দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ ইন বাংলাদেশ, ফিসকল ইয়ার্স ২০১১-২০২০: কান্ট্রি প্রোগ্রাম ইভ্যালুয়েশন' শীর্ষক প্রতিবেদনে গত দশকে বাংলাদেশে নিজের কার্যক্রম নিয়ে বিশ্বব্যাংকের মূল্যায়ন প্রকাশ হয়েছে। এ বিষয়ে সংস্থাটির বক্তব্য হলো পদ্মা সেতুকে ঘিরে সম্পর্কে মতান্তর দেখা গেলেও সংস্থাটির অর্থায়ন কার্যক্রমে তার প্রভাব তেমন একটা পড়েনি। বরং গত এক দশকে দুই পক্ষের আর্থিক সম্পর্কের ব্যাপ্তি আরও বেড়েছে। ২০১১ সালেও বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের মোট অর্থায়ন প্রতিশ্রুতি ছিল প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার। পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থায়ন থেকে সরে আসার পর প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ কমে যায়। যদিও ২০১৪ সালেই তা ৬ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে। ২০১৯ সালে সংস্থাটির প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ ১৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়ায়। আর ২০২০ সালে প্রতিশ্রুতি অর্থায়ন দাঁড়ায় ২১ বিলিয়ন ডলার। আবার একই সঙ্গে অর্থছাড়ও বেড়েছে। ২০১৯ সাল শেষে যার পরিমাণ ছিল প্রায় সাড়ে ৫ বিলিয়ন ডলার।

বিশ্বব্যাংক

বিশ্বব্যাংকের হয়ে কাজ করা সাবেক অর্থনীতিবিদরাও বলছেন, পদ্মা সেতুকে ঘিরে বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের সম্পর্ক বিতর্কিত হয়ে পড়েছিল। যদিও পরে বিশ্বব্যাংক অনুধাবন করেছে, দুর্নীতি নিয়ে তাদের অভিযোগ বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। কোনো অভিযোগই প্রমাণিত না হওয়ায় তিক্ততা আরও বেড়ে যায়। তবে দুই পক্ষই নিজ নিজ প্রয়োজন অনুধাবন করে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ধরে রেখেছিল। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ এখন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (আইডিএ) মধ্যে এককভাবে সর্বোচ্চ ঋণ গ্রহণকারী দেশ।

গত কয়েক বছরে মূলত দুই পক্ষের সদস্য দেশগুলোর প্রয়োজনেই বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের সম্পর্কের উন্নয়ন হয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, দুই পক্ষের প্রয়োজনেই সম্পর্কের আরও উন্নয়ন ও জোরদার হয়েছে। অর্থায়ন প্রতিশ্রুতি ও অর্থছাড়ের পরিসংখ্যানেও এর প্রতিফলন দেখা গিয়েছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)

এক নজরে IMF

পূর্ণরূপ	International Monetary Fund
প্রতিষ্ঠার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর	১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে ব্রেটন উডস সম্মেলনে
আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু	১ মার্চ, ১৯৪৭ সালে
সদর দপ্তর	ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র
বর্তমান সদস্য সংখ্যা	১৯০টি
প্রধানের পদবি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক	ক্রিস্তালিনা জর্জিয়েভা (২০১৯ – বর্তমান)
বাংলাদেশ IMF এর সদস্যপদ লাভ করে	১০ মে, ১৯৭২ সালে
বাংলাদেশ থেকে IMF এর কার্যালয় গুটিয়ে দেওয়া হয়	২০১২ সালে

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)

IMF এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে –

- ✓ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।
- ✓ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি।
- ✓ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সহায়তা প্রদান।
- ✓ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শৃঙ্খলাপূর্ণ বিনিময় ব্যবস্থার প্রবর্তন।
- ✓ বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যহ্রাস প্রতিরোধ।
- ✓ স্থিতিশীল বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- ✓ ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর সমস্যা সমাধানের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।
- ✓ রপ্তানি নীতি সংস্কার করে রপ্তানি বৃদ্ধি করা।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)

আইএমএফের অন্যান্য কার্যক্রম হলো-

- **স্থিতিশীল বিনিময় হার চালু রাখা:** আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের অন্যতম প্রধান কাজ হলো বিশ্বব্যাপী মুদ্রা বিনিময় হারকে স্থিতিশীল রাখা। এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল মুদ্রার মান ও স্বর্ণের মানের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। অবশ্য মুদ্রার মান যাতে একেবারে অপরিবর্তিত না হয় সেই দিকেও আইএমএফ বিশেষভাবে নজর রাখে।

- **বিশ্ববাণিজ্য বর্ধিতকরণ:** বিশ্ববাণিজ্য বর্ধিতকরণ করা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেননা, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল মূলত সমগ্র বিশ্বের অর্থ ও বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাই বিশ্বের উন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য বর্ধিতকরণ ও বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কাজ করে। তাছাড়া বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার একটি এজেন্ট হিসেবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বিশ্ববাণিজ্য বর্ধিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)

- **মুদ্রার অবমূল্যায়ন রোধ:** আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখে যাতে কোনো দেশ ইচ্ছেমতো মুদ্রার অবমূল্যায়ন করতে না পারে। তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র মুদ্রা তহবিলের বিনা অনুমতিতে মুদ্রার মান ১০% পর্যন্ত কমাতে পারে।

- **দুষ্প্রাপ্য মুদ্রার সরবরাহ নিশ্চিতকরণ:** আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা সরবরাহ নিশ্চিত করা। কখনো কখনো কোনো দেশের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সরবরাহের তুলনায় অধিক হয়। যে সকল মুদ্রা স্বর্ণমানে ক্রয় করেও এর চাহিদা মেটানো যায় না সেইগুলোকে দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা বলে। তাই আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল স্বর্ণমানে মুদ্রা ক্রয় করে সংশ্লিষ্ট দেশকে তার চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করে।

- **স্বল্পকালীন ঋণ মঞ্জুর করা:** আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো স্বল্পকালীন ঋণ মঞ্জুর করা। পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের (যেমন স্বল্প উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে) লেনদেনের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। তাই এই লেনদেনের ঘাটতি কাটিয়ে ওঠার জন্য এই সংস্থাটি তখন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)

- **সমন্বয় সাধন:** আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সমন্বয় সাধন। যখন আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্য ও লেনদেনে কোনো ধরনের প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল যেকোনো সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালায়।

- **পরামর্শ দান:** এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর বেশিরভাগই স্বল্পোন্নত এবং এ সব দেশের জনগণের ব্যাপক অসচেতনতা ও কারিগরি অদক্ষতার কারণে এই সকল দেশে উন্নয়ন ব্যাহত হয়। যদি এসব দেশের জনগণকে সঠিক পরামর্শ প্রদান করা যায় তাহলে এসব দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধন করা সম্ভবপর হয়। তাই আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বিভিন্ন দেশের কারিগরি অদক্ষতা দূরীকরণের জন্য এবং আর্থিক ও রাজস্ব নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে।

- **উদ্বৃত্ত মুদ্রা ক্রয়:** আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বিশ্ব বাণিজ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য যেমন দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা সরবরাহ করে তেমনি যেকোনো উদ্বৃত্ত মুদ্রা যদি সে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে তাহলে তা ক্রয় করে উক্ত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালায়।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)

IMF এর সহজ শর্ত (soft condition)	IMF এর Hard Condition বা কঠিন শর্ত
দুর্নীতি রোধ করা।	মুদ্রানীতি আধুনিক করা/ বিনিময় মূল্য বাজারের উপর ছেড়ে দেওয়া।
সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।	রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কার করা।
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।	সামষ্টিক অর্থনীতির দুর্বলতাগুলো সংস্কার করা।
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।	বাজার উদারীকরণ করা/ বাজারে হস্তক্ষেপ না করা।
মানবাধিকার আইন মান্য করা ইত্যাদি।	জ্বালানি খাত বেসরকারিকরণ করা। জ্বালানি খাতে সরকারি ভর্তুকি প্রদান বন্ধ করা।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)

আইএমএফ এর ঋণ দরিদ্র দেশের জন্য আশীর্বাদ না ফাঁদ?

IMF এর ঋণ দানের শর্ত নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, IMF এর ঋণের শর্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঋণগ্রহণকারী দেশগুলোর সরকার ও জনগণের মধ্যে দুর্ভোগ ডেকে আনে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক অভিজ্ঞতা লাভ করে।

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ এর মতে, "বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি বাস্তবায়নের ব্যর্থতার জন্য IMF ই মূল খলনায়ক।"

IMF এবং বাংলাদেশ

সাম্প্রতিক IMF এর ঋণ চাওয়ার কারণ

- **করোনা মহামারি:** ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে চীনের উহান থেকে শুরু হয় করোনা ভাইরাসের যাত্রা যা কয়েক মাসের মধ্যে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে আঘাত হানে ৮ মার্চ, ২০২০ সালে। করোনা মহামারির কারণে বিশ্ব অর্থনীতি যেমন স্থবির হয়ে পড়ে তেমনি বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রগতিও কমতে থাকে। বাংলাদেশের GDP, GNI, মাথাপিছু আয় পূর্বের তুলনায় অনেক কমে যায়। দারিদ্র্যের হার ১৫% এ নামিয়ে আনার কথা থাকলেও ২০২২ পর্যন্ত তা ২০.৫% এ স্থির রয়েছে, প্রবাসী আয়ও কমে গেছে। সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটা সংকট সৃষ্টি করেছে করোনা মহামারি।
- **রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ:** এ যুদ্ধের কারণে গত এক বছর যাবত বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্থিরতা বিরাজ করছে। বিশ্ব আমদানি রপ্তানির অন্যতম কেন্দ্র হলো রাশিয়া ও ইউক্রেন। বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে রাশিয়া খাদ্যশস্য, সার, ভোজ্য তেল, গ্যাস ও জ্বালানি তেল রপ্তানি করতে পারছে না, ফলে বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশেও এ যুদ্ধের প্রভাব লক্ষণীয়।
- **বাণিজ্য ঘাটতি:** আন্তর্জাতিক বাজারে সবকিছুর দাম বৃদ্ধিসহ পরিবহণ খরচও বেড়েছে ব্যাপক হারে। তাই বাংলাদেশের আমদানিতে নাটকীয় উত্থান হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১১ মাসে আমদানি বাড়ে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩৯ শতাংশ। এ বছরের মে মাসে এসে বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়ায় ২ হাজার ৮২৩ কোটি ডলার।

IMF এবং বাংলাদেশ

- **মূল্যস্ফীতি:** চলমান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ দেশের অর্থনীতিতে নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। ডলার সংকটের কারণে টাকার মূল্যের পতন ঘটছে ব্যাপক হারে। ২০২১ সালের জুন-জুলাইয়ের দিকে ১ ডলার সমান ৮৫-৮৬ টাকা ছিল কিন্তু বর্তমানে তা বেড়ে ১০৮ টাকাতে পৌঁছেছে। IMF বলছে বাংলাদেশের বর্তমান মূলস্ফীতির হার ৮.৮ যা ২০২৩ সালে বেড়ে ৯.১% হতে পারে (বর্তমান মূল্যস্ফীতি ৯.৯৪%)।

- **জ্বালানি সংকট:** বাংলাদেশ জ্বালানি আমদানিকারক দেশ। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকটের কারণে বাংলাদেশের জ্বালানি আমদানিতে পড়েছে ভাটা, জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় দ্বিগুন হয়ে গেছে। আর জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির কারণে প্রভাব পড়ছে কৃষি, শিল্প ও পরিবহণ খাতে।

- **চলতি হিসাবের ঘাটতি:** বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি হলো– প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ। করোনা মহামারি ও যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের প্রবাসী আয় কমেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবাসী আয় ছিল ২৪.৭৫ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে কমে হয় ২১.০৪ বিলিয়ন ডলার। এ কারণে বাংলাদেশের মোট আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হয়ে গেছে যার কারণে চলতি হিসাবে ঘাটতি বাড়ছে (বর্তমান প্রবাসী আয় ২১.৬২ বিলিয়ন ডলার)।

IMF এবং বাংলাদেশ

বিশ্বব্যাংক ও IMF এর পার্থক্য

বিশ্বব্যাংক (World Bank)	আইএমএফ (IMF)
➢ বিশ্বের দরিদ্রতর রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে।	➢ আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করে।
➢ উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচিতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সাহায্য করে সে দেশের উন্নয়নে সহায়তা করে।	➢ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখা এবং সুবিন্যস্ত বিনিময় সম্পর্কে উন্নতি সাধন করাই এর লক্ষ্য।
➢ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে যাদের মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (GNP) ১৩০৫ মার্কিন ডলারের নিচে তাদেরকে IDA এর মাধ্যমে বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।	➢ শিল্পসমৃদ্ধ এবং উন্নয়নশীল সকল সদস্য রাষ্ট্রকেই তাদের সাময়িক Balance of Payment সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদি ঋণ সুবিধা প্রদান করে।
➢ শাখা প্রতিষ্ঠান IFC এর মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশের বেসরকারি উদ্যোগসমূহকে উৎসাহ প্রদান করে।	➢ SDR বরাদ্দের মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলোর মুদ্রা রিজার্ভের ঘাটতি পূরণ করে।
➢ বেশিরভাগ অর্থসম্পদ ধারে সংগ্রহ করে আন্তর্জাতিক ফাণ্ড মার্কেট থেকে।	➢ সদস্য রাষ্ট্রগুলো থেকে কোটা অনুযায়ী চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করে।
➢ অথরাইজড ক্যাপিটালের পরিমাণ ১৯০.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যার ১০% এর জোগানদার এর সদস্যবর্গ।	➢ পরিশোধিত চাঁদার পরিমাণ ৩৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ASIAN DEVELOPMENT BANK)

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যাবলি

- **ঋণদান কর্মসূচি:** এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে এর ঋণদান কর্মসূচি। তবে এসব ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক অনেকটা নমনীয় মনোভাব দেখায়। কারণ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা না হলে এসব দেশের পক্ষে অনেক সময় ঋণ গ্রহণ করে তা সুদ সমেত সময় মতো ফিরিয়ে দেয়াও একটি জটিল বিষয়ে পরিণত হতে পারে। তাই এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক তার সদস্য দেশগুলোতে ঋণের সঠিক খাত নির্ধারণের জন্য কাজ করে এবং তদানুযায়ী ঋণ প্রদান করে যাতে তার প্রদত্ত ঋণের কোনো অপচয় না হয়।
- **মূলধন বিনিয়োগ:** যথাযথ ও পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়নি। কারণ এসব দেশের অধিকাংশই দরিদ্র। এজন্য তাদের কাছে নিজ নিজ রাষ্ট্রের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন নেই। এতে করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় না। তাই এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনীতির চাকা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ASIAN DEVELOPMENT BANK)

- **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর অন্যতম একটি কাজ হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত করা। যদি এসকল সদস্য রাষ্ট্রের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমতা আনা না যায় তাহলে এ সংস্থার পক্ষে এ অঞ্চলে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক জোন গড়ে তোলা সম্ভবপর হবে না। আর তাই এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এসব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

- **কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন:** এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর শতকরা প্রায় ৮০ থেকে ৯০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যক্রমের ফলে এর সদস্য দেশগুলোর কৃষিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ সংস্থাটির সদস্য দেশগুলো যাতে কৃষিতে পর্যাপ্ত ঋণ পায় তার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। ফলে এ সংস্থাটির সদস্য দেশ চীন, ভারত, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, জাপানসহ অনেকগুলো দেশের কৃষিতে আজ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ASIAN DEVELOPMENT BANK)

- **স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান:** তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর স্বাস্থ্য সেবার মানের অবস্থা উন্নত পর্যায়ে নেই। তারা স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে নানা ধরনের কুসংস্কারে নিমজ্জিত রয়েছে। তাছাড়া এসব দেশের মানুষের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কেও যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব রয়েছে। তাই এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক তার সদস্য দেশগুলো থেকে অপুষ্টি দূর করে জনগণের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সদস্য দেশ সিঙ্গাপুর, জাপান, থাইল্যান্ড, চীন, ভারত স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বেশ সফলতা অর্জন করেছে।

- **দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়তা:** এশিয়া মহাদেশে মোট দেশের সংখ্যা ৪৬টি। এ সব দেশের অধিকাংশই দরিদ্র। তারা দারিদ্র্যের কারণে নিজেদের মৌলিক ও মানবিক প্রয়োজনগুলো মেটাতে পারে না। তাই এসব দেশের জনগণের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক অনেক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। এসব প্রকল্প এশিয়ার দেশগুলোর পক্ষে নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর ছিল না। আর এ ধরনের কার্যকলাপের ফলে এশিয়ার দেশগুলোতে মাথাপিছু আয় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (NDB)

- ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা এই ৫টি দেশের জোট হলো ব্রিকস।
- ব্রাজিলের ফোরতালেজায় অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ ব্রিকস সম্মেলনে পাঁচ জাতির জোট ব্রিকস ১৫ জুলাই ২০১৪ দি নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (NDB) নামে একটি নতুন ব্যাংক গঠনের চুক্তি স্বাক্ষর করে।
- NDB কে IMF এর বিকল্প ধরা হয়।
- ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ বাংলাদেশ (ষষ্ঠ) সদস্যপদ লাভ করে। সর্বশেষ সদস্য মিশর।
- NDB প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবকাঠামোগত টেকসই উন্নয়নে ঋণ সহায়তা প্রদান করা।

নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (NDB)

IMF এর বিকল্পরূপে ব্রিকস ব্যাংক NDB

বিশ্বের সবচেয়ে বড় উদীয়মান অর্থনীতির দেশ ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার (ব্রিকস) উদ্যোগে গঠিত হয়। NDB ব্যাংক এই দেশগুলোতে অবকাঠামো উন্নয়ন ও উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে NDB কে আইএমএফের বিকল্প হিসেবে ভাবা হচ্ছে। এর কারণ হিসেবে আমরা নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে পারি –

- বিশ্বে একচেটিয়া রাজত্ব প্রতিষ্ঠাকারী বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল গরিব দেশগুলোকে ঋণের ফাঁদে ফেলে ইচ্ছেমতো নাকানি চুবানি খাইয়ে আসছে। শুরুতে যদিও উন্নয়নশীল দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে ঋণ সহায়তা দিয়ে এসব দেশের দারিদ্র্য ক্রমশ কমিয়ে আনার 'মহৎ' উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কাজে কর্মে এসব দেশের কাছে এর মহাজনী চরিত্রই শুধু প্রকট হয়নি একই সঙ্গে এটি যে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের স্বার্থরক্ষার শক্তিশালী এজেন্ট তাও প্রমাণিত হয়েছে। তাই বিকল্প হিসেবে NDB কে বেছে নিবে।

নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (NDB)

- আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্ব ব্যাংক তাদের নিজেদের গড়া সূচক দিয়ে তথ্য-উপাত্ত, দলিলাদি দিয়ে অনুন্নত উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের মানদণ্ড তৈরি করে থাকে। তাই তারাই উন্নয়নশীল দেশে কৌশলে রাজনৈতিক-সামাজিক সাংস্কৃতিক আবহ সৃষ্টি করে রাখে। তাই সময় এসেছে IMF এর বিকল্প খুঁজে নেওয়া।

- IMF এর একচেটিয়া আধিপত্যের বিপরীতে নতুন অর্থনৈতিক শক্তির ৫ দেশ- ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা মিলে 'NDB' নামে এক ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার খবর জানিয়ে বলা হয়, ব্যাংকের পাশাপাশি জরুরি সংকট মোকাবিলায় IMF এর বিকল্প হিসেবে ১০,০০০ কোটি ডলারের একটি মুদ্রা তহবিলও থাকবে।

- IMF-এ উন্নয়নশীল দেশের জন্য অবকাঠামো তহবিলে শিথিলতা নেই। অপরদিকে, NDB-তে প্রাথমিক পুঁজি হিসেবে ৫০ বিলিয়ন বা ৫,০০০ কোটি ডলারের অবকাঠামো তহবিল চালু হয়। উন্নয়নশীল দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে অর্থ সহায়তা দেয়াই এই তহবিলের মূল লক্ষ্য।

নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (NDB)

- ব্রিকস দেশগুলোর জনসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৫০%, মোট বৈশ্বিক উৎপাদনের ২৫%, মোট ভূমির ৩০% ও মোট উৎপাদনের ২০%। সক্ষমতা অনুযায়ী বিশ্ব ব্যাংক, IMF ও জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে তাদের অবস্থান বদলায়নি। বিশ্বব্যাংকের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের ২৫০টি ভোট প্রয়োগ করার বিধান থাকলেও আসলে ভোট দেয়ার শতকরা ৮০% ক্ষমতা পশ্চিমা ধনী দেশগুলোর এবং ব্যাংক পরিচালনার মূল নিয়ন্ত্রণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে।

- বাধ্যতামূলকভাবে বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান হবেন একজন মার্কিনি এবং IMF এর প্রধান হবেন একজন পশ্চিম ইউরোপীয়। অন্য কোনো দেশের প্রতিনিধির প্রবেশাধিকার এখানে নেই। সুতরাং উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকে ব্রিকস জোটের নীরব প্রতিবাদও বলা যায়। বিভিন্ন কারণে বিশ্বে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর পশ্চিমা অর্থব্যবস্থায় যখন ভাটার টান তখন এরকম একটি উদ্যোগ স্বাভাবিকভাবে সবার মনোযোগ কেড়েছে।

নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (NDB)

- একচেটিয়া ক্ষমতা ভারসাম্যের আঘাত হিসেবে আসতে পারে ব্রিকস এর উন্নয়ন ব্যাংক। প্রাথমিকভাবে সদস্য দেশগুলো প্রত্যেকে ১০ বিলিয়ন ডলার দিয়ে তহবিল গঠন করেছে। সদস্য দেশগুলোর বৈদেশিক মুদ্রার বিশাল রিজার্ভ ও এই মুহূর্তে পশ্চিমা দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি উদ্বৃত্ত সঞ্চয় রয়েছে, যা অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করেও তারা শেষ করতে পারছে না। পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানকে অপর্যাপ্ত সুদে বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। সুতরাং এরকম একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা তাদের নিজেদের অর্থনীতির গতিশীলতার জন্যও অপরিহার্য হয়েছে। নিজেদের উন্নয়নের পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিতে অবদান রাখার যথেষ্ট সম্ভাবনা তাদের রয়েছে।

- উন্নয়নশীল বিশ্বের শাসকশ্রেণি তৈরি করা IMF ও বিশ্বব্যাংকের অন্যতম অঘোষিত এজেণ্ডা। এতে এসব দেশের ঘাড়ে চেপে বসার কাজটি অনেক সহজ হয়। শর্তের পর শর্ত দিয়ে নানা ধাপে ঋণের চক্রে আটকাতে এর জুড়ি নেই। ঋণ শোধের পাশাপাশি IMF এর অর্থনীতি ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন অনেক প্রকল্প হাতে নেয়ায় বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো নিজেকে বহুজাতিক কোম্পানির বাজারে পরিণত করেছে। তাই NDB সকলের কাছে বিকল্প হবে।

নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (NDB)

- World Bank ও IMF এর Structural Adjustment Program (SAP) কর্মসূচি রাজনৈতিক অর্থনীতির পলিসি সমাজের ভারসাম্য ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়েছে। শিল্পায়ন নিরুৎসাহিত করে সামাজিক ব্যবসা, শেয়ার ব্যবসা, ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের ওপর বীমা, রিয়েল এস্টেট ব্যবসা ইত্যাদিকে বেশি গুরুত্ব দেয়ায় অনুৎপাদনশীল খাতে পুঁজির লগ্নি যত বেড়েছে উৎপাদনশীল খাত তত গুরুত্ব হারিয়েছে।

- পরিশেষে বলা যায়, বিশ্ব অর্থনীতি পশ্চিমা পুঁজিবাদের চক্রে পড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য BRICS এর New Development Bank যে উন্মুখ প্রত্যাশা সৃষ্টি করছে তার সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হলো, জোটে ৪ মহাদেশের ৮টি দেশ সদস্য হিসেবে রয়েছে এবং সব দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সমান না হলেও সবাইকে সমান হারে মূলধন যোগান দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে ধরে নেয়া যায় সিদ্ধান্তের বেলায়ও একক কর্তৃত্বের বদলে সবার সমান অংশীদারিত্ব থাকবে। তবে পুরোটাই নির্ভর করছে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সদিচ্ছার ওপর।

এআইআইবি (AIIB)

বিশ্বব্যাংক এর বিকল্প হিসেবে AIIB

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ চীনের AIIB গঠনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভিন্ন এক মেরুকরণের সূচনা হয়েছে। AIIB-কে বিশ্বব্যাংকের বিকল্প মনে করা হচ্ছে কারণ –

- বিশ্বব্যাংক এখন অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে বিনিয়োগে উৎসাহী নয়। বরং তারা এখন সহজ শর্তে ঋণ ও 'Knowledge Sharing'- এর উপর গুরুত্ব দিচ্ছে।
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন নিজেরাই আর্থিক সংকটে রয়েছে। ইউরোজোনে মূল্য হ্রাসের ধারা অব্যাহত থাকলে এবং রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধের অবসান না হলে এখানকার অর্থনীতি মন্দাক্রান্ত হওয়া বিচিত্র নয়। এ অবস্থায় ইউরোপের সংকটে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। বরং দেশটি নিজের সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। তখন স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিম ইউরোপে AIIB জনপ্রিয় হওয়ার সুযোগ রয়েছে।
- বিশ্বব্যাপী তেলের মূল্য হ্রাসের ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমা দেশগুলোর এমন একটি সম্ভাব্য হতাশাজনক পরিস্থিতিতে উন্নয়নশীল বিশ্বকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা বা প্রকল্প সহায়তা দেওয়া কঠিন হবে। অন্যদিকে অধিকাংশ উদীয়মান দেশ তাদের অর্থনীতিতে সাময়িক সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে, তার মধ্যে চীনের অর্থনীতি খারাপ পারফরম্যান্স করবে না।

এআইআইবি (AIIB)

- UNCTAD Report অনুসারে বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগকারী দেশ হলো চীন। এদিকে চীনের রয়েছে বিরাট আন্তর্জাতিক মুদ্রার মজুদ। তাই চীন উন্নয়শীল বিশ্বে এমনকি, আধুনিক বিশ্বেও বিনিয়োগ করবে। তবে তারা এই বিনিয়োগ সরাসরি না করে নতুন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করতে চায়। এভাবেই দেশটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পশ্চিমা দুনিয়ার প্রভাবকে খর্ব করতে চায়। সেই প্রেক্ষাপটে ২০১৩ সালেই চীনের নীতিনির্ধারকদের কাছ থেকে এশিয়ায় একটি অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আগ্রহের কথা জানা যায় এবং অতিদ্রুত বেইজিংয়ে MoU স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় AIIB। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো পেয়ে যায় দ্রুত উন্নয়নের মহাসড়কে ওঠার মতো একটি সিঁড়ি।
- উন্নয়নশীল বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় আর্থিক চাহিদা মেটানোর মতো সামর্থ্য পশ্চিমা বিশ্বের এখন নেই। Word Bank, IMF, ADB এর পক্ষে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তদুপরি বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের যথাক্রমে প্রকল্প ও জরুরি আর্থিক সহায়তা প্রদানের সঙ্গে অনেক কঠিন শর্ত ও তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত থাকে বলে উন্নয়নশীল বিশ্বকে তাদের আজ্ঞাবহ হয়ে চলতে হয়। এমন একটি পরিস্থিতিতে বিশ্বে নতুন আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার তাগিদ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

এআইআইবি (AIIB)

- বিশ্বব্যাংক Structural Adjustment Program অনুসরণ করে ঋণ প্রদান করে থাকে। এখানে ঋণ কীভাবে উঠিয়ে নিতে পারবে তার উপর গুরুত্ব দেয়। আর AIIB গুরুত্ব দেয় PRC Policy অনুসরণের মাধ্যমে কীভাবে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে তার উপর।
- বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের মূলধনের চেয়ে AIIB এর মূলধনের পরিমাণ বেশি। AIIB ১০০ বিলিয়ন ডলার মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে, যা এডিবির দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩) এবং বিশ্বব্যাংকের ৫০% বা অর্ধেক। তাই অদূর ভবিষ্যতে AIIB এর মূলধন উক্ত দুটি ব্যাংককে ছড়িয়ে যাবে।
- ট্রাম্প বৈশ্বিক আর্থিক ও সামরিক নিরাপত্তায় বিনিয়োগ করতে আগ্রহী ছিল না। অপরদিকে চীন বিশ্ব অর্থনৈতিক ও সামরিক নিরাপত্তার নেতৃত্ব নিতে চায়। তাই ট্রাম্প ও চীনা নীতির কারণে AIIB এগিয়ে থাকার সম্ভাবনা তৈরি হবে।
- নতুন নেতৃত্বের খোঁজে বিশ্ববাসী। বিশ্বব্যাংক ও এডিবির বিকল্প হিসেবে খুব শীঘ্রই AIIB জনপ্রিয়তা পাবে।
- এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ও আফ্রিকা অঞ্চলের উন্নয়নশীল ও অনুন্নত রাষ্ট্রগুলো বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ গ্রহণ করে ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেনি। অথচ, চীন ২০১০ সালের পর থেকে ঋণ নীতিমালা পরিবর্তন করতে বেশ ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে আফ্রিকার ভাগ্য উন্নয়নে চীনের ভূমিকা অতুলনীয়।

ব্রিকস (BRICS)

ব্রিকস হলো ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা এই ৫টি উদীয়মান শক্তির অর্থনৈতিক জোট।

BRICS এর উদ্দেশ্য পূরণে চ্যালেঞ্জসমূহ

- **নিজস্ব মুদ্রার ব্যবহার:** ব্রিকস নেতারা নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারের পরিবর্তে নিজস্ব মুদ্রা ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে নিজেদের জন্য অধিক ভোটের ক্ষমতা চেয়েছেন।

- **পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন:** বিশ্বের টেকসই উন্নয়ন, বৈশ্বিক সুশাসন ও পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এ জোটকে অগ্রাহ্য করার আর কোনো উপায় নেই। তবে সমালোচকেরা ব্রিকসকে কেবলই ‘কথার দোকান’ বলে অভিহিত করছেন। কেননা, কথার ফুলঝুরি ছড়ানো এই ব্রিকস পরিবারের মধ্যে আছে সন্দেহ আর অবিশ্বাস। তাই পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন ব্রিকসের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ব্রিকস (BRICS)

- **ঐকমত্য অর্জন:** এখন পর্যন্ত জোট হিসেবে ব্রিকসের সফলতা উল্লেখ করার মতো নয়। ব্রিকসের সম্পর্কে ভারতের বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উদয়ন বলেছেন, "এ জোটের একটা অর্থনৈতিক অবস্থান আছে। তবে রাজনৈতিক বিষয়ে মনে হচ্ছে, ব্রিকস দেশগুলোর একমত হওয়া মুশকিল। শ্রীলঙ্কা বিষয়ে ভারত ও চীন দুটি আলাদা গোষ্ঠীতে গিয়ে ভোট দিয়েছে। হিমালয়ের পাদদেশে ডোকলাম ইস্যু ভারত-চীনের রাজনৈতিক সমঝোতার সম্ভাবনাকে প্রশ্নের মুখেই রেখে দিচ্ছে। চীন 'ব্রিকস-প্লাস' নামের আরেকটি সংস্থার জন্ম দিয়ে প্রকৃতপক্ষে 'ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোড' এর সাফাই গাইছে, যা ভারতের লক্ষ্যের সাথে যায় না। ব্রিকস-এর সদস্য দেশগুলোর মাঝে গণতান্ত্রিক চেতনার অভাব রয়েছে। সকল দেশ সেখানে সমান অধিকার রাখছে না।" অর্থাৎ এ জোটে অর্থনৈতিক ঐক্য রাজনৈতিক ঐক্যে পরিণত করা ব্রিকসের সদস্য দেশগুলোর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।
- **ব্রাজিল ও রাশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান:** ব্রাজিল আর রাশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি। এই দেশ দুটির সমস্যাগ্রস্ত অর্থনীতিকে বাঁচাতে এগিয়ে আসা ব্রিকসের জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ব্রিকস (BRICS)

- **দক্ষিণ আফ্রিকাকেও সংগঠনের অন্য চারটি দেশের সাথে এক কাতারে রাখা:** দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড্যানি ব্র্যাডলাউ ব্রিকস-এ সাউথ আফ্রিকার অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে খুব বেশি ভালো কিছু পাননি। 'দ্যা কনভারসেশন' এ এক লেখায় তিনি বলেন, "যে বিশ্বের দরবারে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অর্থনৈতিক নেতৃত্বের আসনে বসাতে সংস্থাটি একেবারেই সক্ষম হয়নি।" বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর গ্রুপ 'জি-৭' থেকে পরবর্তীতে 'জি-২০' তৈরি করা হয়, যার মাঝে ব্রিকস-এর দেশগুলোও রয়েছে। কিন্তু সেই ফোরামে গিয়ে ব্রিকস নেতারা ব্রিকস-এর স্বার্থ দেখেননি। সেখানে যাদের অর্থনৈতিক শক্তি বেশি, তারাই জোরেশোরে কথা বলেছে। আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের সদস্য দেশগুলোর অধিকারের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। সেক্ষেত্রে লাভবান হয়েছে চীন, ভারত ও ব্রাজিল।
- **অভিন্ন ভূরাজনৈতিক স্বার্থ অর্জন:** ব্রিকস-এর নিজস্ব কোনো ভূরাজনৈতিক স্বার্থই নেই- পাঁচটি দেশের বিপরীতমুখী ভূরাজনৈতিক স্বার্থ ছাড়া। তাই নিজেদের উন্নয়নের পাশাপাশি অভিন্ন স্বার্থে এগিয়ে যাওয়া ব্রিকসের বড় চ্যালেঞ্জ। একেক দেশের জাতীয় নীতি ভিন্ন হওয়ায় তা তাদের জনগণকে অর্থনৈতিক সহযোগিতার সুবিধা ভোগ করা থেকে বিরত রেখেছে। আবার ভারতও তার ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের সাথে একই টেবিলে বসে অর্থনৈতিক লেনদেন করেছে বেশ সাবধানেই। দেশগুলোর নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় ব্রিকস-এর ভূরাজনৈতিক স্বার্থের সাথে এক পথে হাঁটতে হবে।

G-7 (GROUP OF SEVEN)

- G-7 এর পূর্বনাম ছিল Group of Eight. এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ নভেম্বর।
- এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্বের শিল্পোন্নত ৮টি দেশ নিয়ে।
- দেশগুলো হলো – যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা, জাপান, জার্মান, ইতালি ও রাশিয়া।
- এর একমাত্র এশীয় দেশ জাপান।
- পরবর্তীতে রাশিয়াকে ক্রিমিয়া ইস্যুতে বহিষ্কার করা হলে G–8 এর পরিবর্তিত নাম হয় G–7। এর কোনো সদর দপ্তর নেই।

vs BRICS

G-7 (GROUP OF SEVEN)

বিভিন্ন সময়ে গৃহীত G-7 উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত

- **কারবিস বে ডিক্লারেশন অন হেলথ :** ১২ জুন, ২০২১ ভবিষ্যতে বৈশ্বিক মহামারি ঠেকানোর লক্ষ্যে জি-৭ 'কারবিস বে ডিক্লারেশন অন হেলথ' নামক পরিকল্পনা ঘোষণা করে। এই পরিকল্পনায় রয়েছে রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা এবং টিকা উদ্ভাবন ও অনুমোদনের সময়সীমা ১০০ দিনের মধ্যে নামিয়ে আনা, সম্ভাব্য সংক্রামক রোগের আর্বিভাবের ওপর নজরদারির জন্য বৈশ্বিক নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করা, জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের সক্ষমতা বাড়ানো, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংস্কার এবং তাকে শক্তিশালী করা। ঘোষণাপত্রে সংক্রামক রোগের ওপর নজরদারির এই ব্যবস্থাকে 'প্যানডেমিক রাডার' বলে অভিহিত করা হয়।

G-7 (GROUP OF SEVEN)

➢ **নেচার কম্প্যাক্ট চুক্তি :** জি-৭ নেতারা 'নেচার কম্প্যাক্ট' নামে একটি চুক্তি সই করেছেন, যাতে জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা ও নষ্ট রোধ করার বিষয়টি রয়েছে। এছাড়া ২০১০ সালের তুলনায় ২০৩০ সালের মধ্যে তাদের কার্বন নির্গমন অর্ধেকে কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতির কথাও রয়েছে। তারা এই দশকের শেষ নাগাদ বিশ্বজুড়ে ভূমি ও সমুদ্রের কমপক্ষে ৩০ শতাংশ সুরক্ষা দিতে সম্মত হয়েছেন।

BRI

Build Back Better World (B3W) Project : ১২ জুন, ২০২১ চীনের ক্রমবর্ধমান Belt & Road Initiative (BRI) প্রকল্পের প্রভাব মোকাবিলায় Build Back Better World (B3W) নামে অবকাঠামো সহায়তা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে জি-৭। পরিকল্পনাটির প্রস্তাব করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এ কর্মসূচির আওতায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কাঠামোগত উন্নয়নে বিশাল অঙ্কের সহায়তা দিতে যাচ্ছে জি-৭ দেশগুলো।

ডি-৮ (DEVELOPING EIGHT)

- ১৯৯৭ সালের ১৫ জুন তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ড. নাজিমুদ্দিন এরবাকানের প্রস্তাব অনুসারে ওআইসিভুক্ত ৮টি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র নিয়ে ডি-৮ অর্থনৈতিক উন্নয়ন জোট গঠিত হয়।
- এ জোটের সদস্যরাষ্ট্রগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিশর ও নাইজেরিয়া।
- ডি-৮ এর সদর দপ্তর তুরস্কের ইস্তানবুলে অবস্থিত।

ডি-৮ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সংহতি ও সহযোগিতা জোরদার করা।
- আটটি উন্নয়নশীল মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করা।
- সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নাগরিকদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।
- আন্তর্জাতিক ফোরামে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমঝোতাভিত্তিক নীতি গ্রহণ।
- উন্নত বিশ্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দরকষাকষির জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ডি-৮ (DEVELOPING EIGHT)

ডি-৮ এর সহযোগিতার ক্ষেত্র

সহযোগিতার ক্ষেত্র	নেতৃত্বদানকারী রাষ্ট্র
১. পল্লি উন্নয়ন (Rural Development)	বাংলাদেশ
২. ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম (Micro Credit Program)	
৩. কৃষি (Agriculture)	পাকিস্তান
৪. অর্থ (Finance)	মালয়েশিয়া
৫. ব্যাংকিং (Banking)	
৬. বিরাষ্ট্রীয়করণ (Denationalisation)	
৭. দারিদ্র্য বিমোচন (Proverty Alleviation)	ইন্দোনেশিয়া
৮. মানবসম্পদ উন্নয়ন (Human Resource Development)	
৯. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Science and Technology)	ইরান
১০. শিল্প (Industry)	মিশর
১১. বাণিজ্য (Commerce)	
১২. স্বাস্থ্য (Health)	তুরস্ক
১৩. জ্বালানি ও খনিজসম্পদ (Fuel and minerals)	নাইজেরিয়া

G-77 (GROUP OF 77)

➲ ১৯৬৪ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে জেনেভায় আঙ্কটাড গঠিত হয়। আঙ্কটাড গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিলে উন্নত ও উন্নয়শীল বিশ্বের জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান পার্থক্য হ্রাসে পদক্ষেপ গ্রহণ।

➲ ১৯৬৪ সালের ১৫ জুন আঙ্কটাডের মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে গড়ে উঠে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়শীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ৭৭-জাতি গোষ্ঠী।

➲ আঙ্কটাডের সব কয়টি সম্মেলনে এ গোষ্ঠী একটি অভিন্ন ও ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রেখে UNCTAD এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালায়।

➲ প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য সংখ্যা ছিল ৭৭। বর্তমান সদস্য ১৩৪ (সর্বশেষ সদস্য দেশ ইকুয়েডর)। উন্নয়শীল দেশগুলো এ গোষ্ঠীর সদস্য। এর কোনো সদর দপ্তর নেই। এর বর্তমান চেয়ারম্যান মুরাদ আহমিয়া।

➲ বাংলাদেশ G-77 এর চেয়ারম্যান ছিল ১৯৮২-৮৩।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কার্যক্রম

০১ সংক্রামক ব্যাধি নির্মূল

০২ স্বাস্থ্য সংরক্ষণ

০৩ মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন

০৪ গবেষণা

০৫ স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন

০৬ স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি

০৭ মহামারি প্রতিরোধ

০৮ শিশুরোগ প্রতিরোধ

০৯ মানসিক স্বাস্থ্য

১০ এইডস প্রতিরোধ

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) পরিচালনা পদ্ধতি সমালোচনামূলকভাবে পর্যালোচনা করুন। সম্প্রতি চীন কর্তৃক প্রস্তাবকৃত ও ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (AIIB) গঠন মাধ্যমে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যক্রম কী ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে? AIIB গঠনের প্রেক্ষিতের আলোকে আলোচনা করুন। [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- BRICS কী? এটি কবে, কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়? কোন কোন দেশ এর সদস্য? [৩৬তম ও ৩৩ বিসিএস লিখিত]
- ব্রেটন উডস্ (Bretton Woods) প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- ডব্লিউটিও (WTO) এর কার্যাবলি সংক্ষেপে লিখুন। [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- D-8 (ডি-৮) এর সদস্য দেশসমূহের নাম লিখুন। [৩৩তম বিসিএস লিখিত]

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব রোধে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ

কপ (COP) সম্মেলন, ১৯৯৫

COP (Conference of the Parties) হলো UNFCCC কর্তৃক আয়োজিত জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলনের নাম। কপ-১ বা প্রথম বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৮ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিল, ১৯৯৫ সালে। জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ১৯৬টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল।

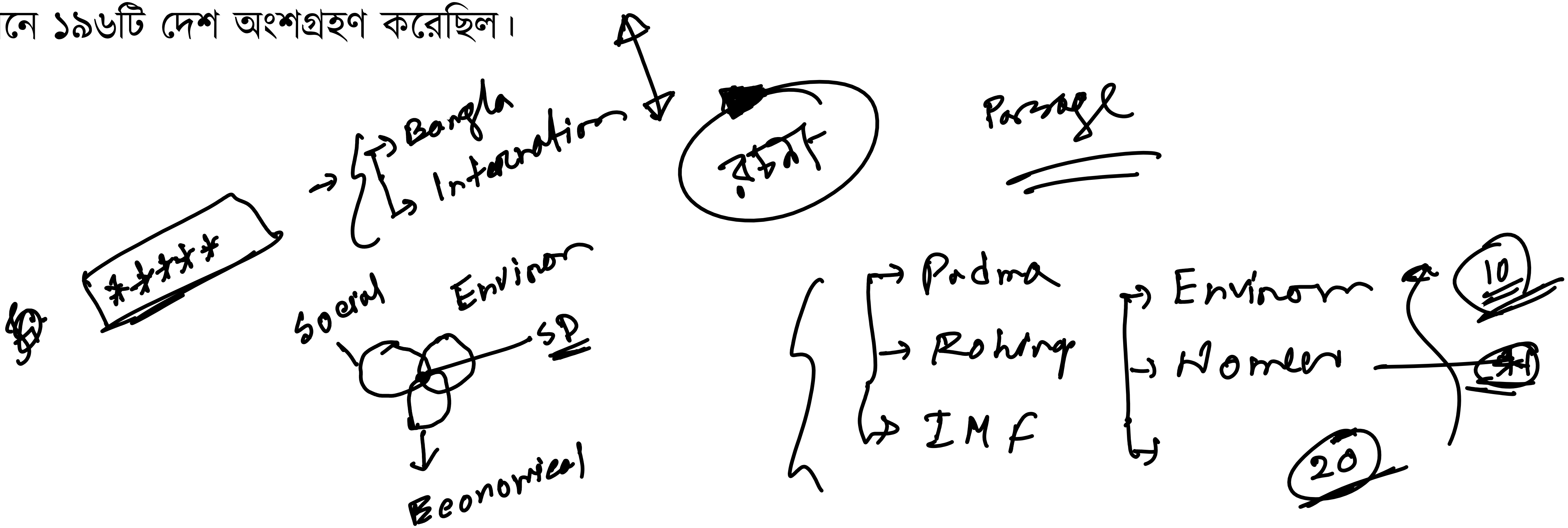

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব রোধে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ

COP – 21

২০১৫ সালের জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন, COP-21 ফ্রান্সের প্যারিসে ৩০ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেই গৃহীত হয় ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তি।

প্যারিস চুক্তি

সংক্ষেপে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি

২০১৫ সালের ডিসেম্বরে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে ১৯৭টি দেশের মধ্যে স্বাক্ষর করে ১৯৫টি দেশ। শুধু সিরিয়া ও নিকারাগুয়া চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করেনি। এই চুক্তিতে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনা এবং নিয়মিত অগ্রগতি পর্যালোচনার বিষয়ে দেশগুলো নিজেরা আইন তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তবে এ প্রতিশ্রুতি পূরণে দেশগুলোর কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা প্যারিস চুক্তিতে রাখা হয়নি। ঐতিহাসিক এ চুক্তি অনুযায়ী–

- ✓ শিল্প নির্গমন মাত্রা কমিয়ে আনা হবে।
- ✓ যুক্তরাষ্ট্র তার গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন ২০২৫ সালের মধ্যে ২৬-২৮ শতাংশ কমিয়ে আনবে।
- ✓ কয়লার বদলে বিকল্প উৎসে জোর দেওয়া হবে।
- ✓ উন্নত দেশগুলো দূষণের জন্য দায়ী সেহেতু আমেরিকার মতো উন্নত দেশগুলো গরিব দেশগুলোকে বছরে ১০ হাজার কোটি ডলার সাহায্য দেবে।
- ✓ ভবিষ্যতে এই ক্ষতিপূরণ বাড়বে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব রোধে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ

কপ-২৭ (COP-27)

মিশরের শারম আল শেখে ২০২২ সালের ৬ থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত কপ-২৭ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের প্রধান ফলাফল হলো-

- প্রথমবারের মতো 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড' গঠনে ঐকমত্য। বন্যা, খরা এবং জলবায়ু সংক্রান্ত অন্যান্য দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে এখান থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। তবে 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' তহবিলের আকার কত বড় হবে, কীভাবে কোন উৎস থেকে অর্থের যোগান আসবে আর এর বন্টন কীভাবে কোন পদ্ধতিতে হবে এসবই চূড়ান্ত হবে পরবর্তী সম্মেলনে।
- এ সম্মেলনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকের মধ্যে রয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিন হাউজ গ্যাস ৪৫% হ্রাস করা।
- ২০৩০ সাল পর্যন্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে প্রতিবছর কমপক্ষে ৪ ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা যেন ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমনে শূন্যতে পৌঁছাতে সক্ষম হওয়া যায়।
- বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখতে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনতে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানায় উন্নত দেশগুলো। ২০১৫ সালে ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তিতে দেশগুলো তাপমাত্রা কমানোর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়।
- ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তহবিল গঠন করে স্বল্পোন্নত বিপদাপন্ন দেশগুলোর আস্থা পুনরুদ্ধার করা।

পরিবেশ বিষয়ক প্রটোকলসমূহ

কিয়োটো (জাপান) প্রটোকল

কিয়োটো প্রটোকলের মূলনীতি (Main Principles of Kyoto protocol)

'জাতিসংঘের Framework Convention of Climate Change UNFCCC এর অধীন কিয়োটো প্রটোকলের মূলনীতি ৬ টি। যথা:

১. কিয়োটো প্রটোকল সরকার কর্তৃক লিখিত এবং জাতিসংঘের অধীন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হবে ।

২. স্বাক্ষরকৃত রাষ্ট্রসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত। যথা:

- ✓ শিল্পোন্নত দেশসমূহ যাদের গ্যাস নির্গমন হ্রাস বাধ্যতামূলক; এবং
- ✓ শিল্পে অনগ্রসর দেশসমূহ যাদের গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন বাধ্যতামূলক নয়।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা-22

- NAPA

পরিবেশ বিষয়ক প্রটোকলসমূহ

৩. যে সকল শিল্পোন্নত দেশ যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিয়োটো প্রটোকল কর্তৃক নির্ধারিত গ্যাস নির্গমন হ্রাসের মাত্রা অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয় তাহলে শাস্তি হিসেবে পরবর্তী টার্গেটে তাকে ৩০% গ্যাস নির্গমন হ্রাস করতে হবে।

৪. সকল শিল্পোন্নত দেশসমূহকে ২০১২ সালের মধ্যে গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনের মাত্রা সংশ্লিষ্ট দেশের ১৯৯০ সালের মধ্যে নির্গমনের মাত্রার চেয়ে ৫ শতাংশ কমাতে হবে।

৫ কিয়োটো প্রটোকলে Flexible Mechanism অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মাধমে শিল্পোন্নত দেশ গ্যাস নির্গমন কমাতে না পারলে তার পরিবর্তে নির্ধারিত আর্থিক ক্ষতিপূরণ অন্যান্য অনগ্রসর দেশগুলোকে প্রদান করবে।

৬. কিয়োটো প্রটোকলের মাধ্যমে জার্মানির বনভিত্তিক Clean Development Mechanism - CDM Project - প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই কর্তৃপক্ষ আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাত্রা নির্ধারণ করবে এবং CDM Project - এর আওতায় যথাযোগ্য অনগ্রসর রাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণের অর্থ সহায়তা প্রদান করবে।

পরিবেশ বিষয়ক প্রটোকলসমূহ

কিয়োটো প্রটোকলের উদ্দেশ্যে (Objectives of Kyoto)

কিয়োটো প্রটোকলের মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাপী গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা সহনশীল রাখা। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনের মাত্রা ৫% হারে বেড়ে চলেছে। তা পৃথিবীকে এক সময় ধ্বংস করে দিতে পারে। Inter-governmental Panel on Climate change (IPCC) নামক সংস্থার প্রতিবেদন মোতাবেক ২১০০ সাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে তা ৫-৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। কিন্তু কিয়োটো প্রটোকলের বিধান মেনে চললে ২০৫০ সাল নাগাদ পৃথিবীর তাপমাত্রা গড়ে ০.০২ ডিগ্রী থেকে ০.২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

পরিবেশ বিষয়ক প্রটোকলসমূহ

কিয়োটো প্রটোকলের উদ্দেশ্যে (Objectives of Kyoto)

কিয়োটো প্রটোকলের মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাপী গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা সহনশীল রাখা। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনের মাত্রা ৫% হারে বেড়ে চলেছে। তা পৃথিবীকে এক সময় ধ্বংস করে দিতে পারে। Inter-governmental Panel on Climate change (IPCC) নামক সংস্থার প্রতিবেদন মোতাবেক ২১০০ সাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে তা ৫-৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। কিন্তু কিয়োটো প্রটোকলের বিধান মেনে চললে ২০50 সাল নাগাদ পৃথিবীর তাপমাত্রা গড়ে ০.০২ ডিগ্রী থেকে ০.২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP

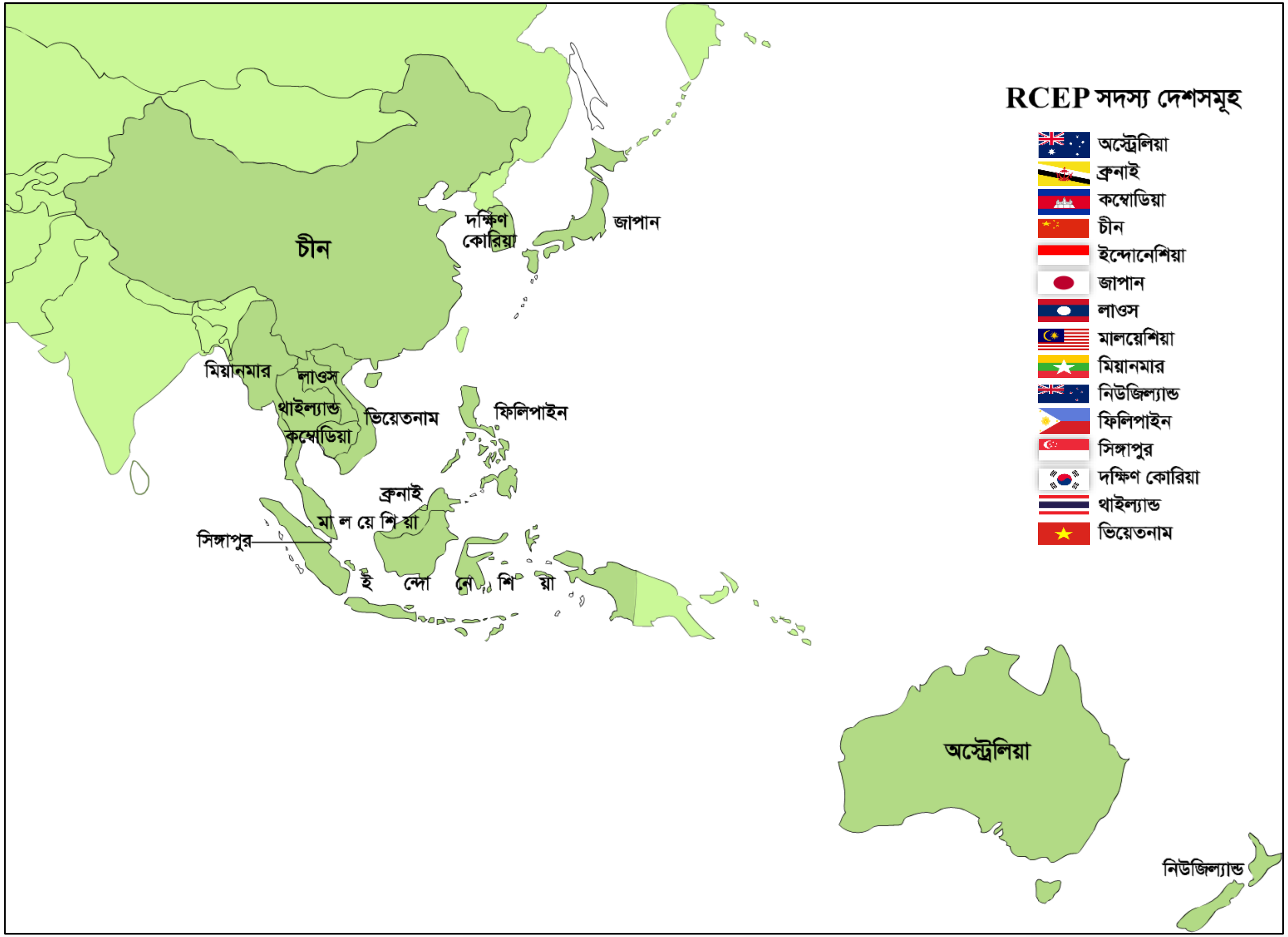

REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP

RCEP এর মূল লক্ষ্য

- নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যে শুল্ক কমানো।
- সরবরাহ শৃঙ্খল (Supply chain) শক্তিশালী করা।
- ই-কমার্সের জন্য নতুন বিধিবিধান চালু করা।
- বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ, টেলিযোগাযোগ, আর্থিক সেবা, ও অন্যান্য পেশাদারি সেবাও এর আওতাভুক্ত হবে।

REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP

চুক্তির গুরুত্ব

- RCEP কার্যকরের পরবর্তী ২০ বছরে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃবাণিজ্যে আমদানি পণ্যে ৯২ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক কমানো হবে। সেবা খাতের কমপক্ষে ৬৫ শতাংশ অন্য সদস্য দেশগুলোর বিনিয়োগকারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।
- তথ্যপ্রবাহের জন্য ক্রস-বর্ডার রুলস চালু করে ডিজিটাল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ কমিয়ে আনা হবে। সদস্য দেশগুলোকে উৎসাহিত করা হবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অপ্রয়োজনীয় প্রতিবন্ধকতা যেমন কোটা বা লাইসেন্সের মাধ্যমে বাণিজ্যে বিধিনিষেধ আরোপ না করার জন্য।
- তুলনামূলক কম খরচে কার্যকর ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড সাপ্লাই চেইন গড়ে ওঠার ফলে অনেক কম সময়ে ও কম খরচে কাঁচামাল সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। ফলশ্রুতিতে উৎপাদন খরচ কম হবে।
- উৎপাদন খরচ যখন কমে যাবে, স্বাভাবিকভাবেই পণ্যের বিক্রয় বা রপ্তানি মূল্য কমে যাবে। ফলে আমদানিকারক দেশগুলো আগের তুলনায় কম মূল্যে বেশি পণ্য আমদানি করতে পারবে। প্রতিক্রিয়ায় রপ্তানিকারক দেশের মোট পণ্য রপ্তানির পরিমাণও অনেক বেড়ে যাবে।
- প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সদস্য দেশগুলো অন্য প্রতিযোগীদের তুলনায় কম মূল্যে পণ্য রপ্তানি করে নতুন বাজার দখল করবে এবং অধিক রপ্তানির মাধ্যমে বাড়তি বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনে সক্ষম হবে।
- RCEP কার্যকরের ফলে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বিনিয়োগ বেড়ে যাবে। ফলে বড় বড় বিনিয়োগকারী দেশ, যেমন: চীন, জাপান, কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া জোটভুক্ত অন্যান্য দেশ যেমন কম্বোডিয়া, মিয়ানমার, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনামে বেশি বেশি বিনিয়োগ করবে। এতে করে বড় বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ অন্যান্য দেশে কমে যেতে পারে।

REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP

বাংলাদেশের করণীয়

আরসিইপির ফলে বাংলাদেশের বাণিজ্য খাতে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তা মোকাবিলায় কয়েকটি পদক্ষেপ বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।

প্রথমত, RCEP আসিয়ানভুক্ত ও আসিয়ানের সঙ্গে যাদের মুক্তবাণিজ্য চুক্তি রয়েছে, তাদের চুক্তি। বাংলাদেশ আসিয়ানভুক্ত নয়। তাদের সঙ্গে কোনো মুক্তবাণিজ্য চুক্তিও নেই। ফলে আরসিইপি ইস্যুতে বাংলাদেশের করার কিছু নেই।

তবে বাংলাদেশ এখন যে কাজটি করতে পারে সেটি হলো, জোটভুক্ত যেসব দেশের সঙ্গে বর্তমানে আমাদের বাণিজ্য চুক্তি রয়েছে, সেগুলো সঠিকভাবে কাজে লাগানো। যেমন চীন আমাদের ৯৭ শতাংশ পণ্যে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা দিয়েছে। এটি কাজে লাগাতে পারলে রপ্তানি বেড়ে যাবে বাংলাদেশের। এর পাশাপাশি সরকার আরসিইপি জোটের সঙ্গে বাণিজ্যিক সুবিধার বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যে বিষয়ে বাংলাদেশকে উদ্যোগ নিতে হবে, সেটি একান্তই আমাদের নিজস্ব বিষয়। পরিবর্তিত প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে সাফল্য অর্জনের জন্য আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে বৈচিত্র্য আনতে হবে। এছাড়া উৎপাদন ব্যয় কমানো, শক্তিশালী মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার মতো উদ্যোগ নিতে হবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশকে কপিরাইট, ই-বাণিজ্যসহ অন্যান্য বিষয়ের দিকে আরও বেশি নজর দিতে হবে।

তৃতীয়ত, প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলায়, বিশেষ করে আরসিইপিতে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশ বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক) ও এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্টের (এপিটিএ) মতো চ্যানেলগুলো ব্যবহার করতে পারে।

চতুর্থত, বাংলাদেশকে এখন থেকেই আঞ্চলিক জোটগুলোতে মনোযোগী হতে হবে এবং সম্পৃক্ততা বাড়িয়ে সুবিধা নিতে হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) করতে হবে। নিজেদের পণ্যের গুণগত মান বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্র্যান্ডিং করতে হবে।

বিশ্বের বড় একটি বাজারের সৃষ্টি হলো আরসিইপির মাধ্যমে। সেটি যেমন জোটের সদস্য দেশগুলোর নিজেদের জন্য, তেমনই বাইরের দেশগুলোর জন্যও। ইইউ যেমন সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ সুরক্ষার পাশাপাশি উদীয়মান অর্থনীতিগুলোর অগ্রযাত্রায় বড় ভূমিকা রেখে যাচ্ছে, আরসিইপি জোটটিও একইভাবে আশীর্বাদ হয়ে উঠতে পারে আমাদের জন্য। আবার যেকোনো চ্যালেঞ্জই নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। আরসিইপি কার্যকরের ফলে বাংলাদেশের সামনে যেসব চ্যালেঞ্জের উদ্ভব হবে, ইতিবাচক মানসিকতায় মোকাবিলা করতে পারলে সেগুলোই আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার প্রভাবক হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং আরসিইপিকে আপদ বিবেচনা করে বসে না থেকে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য কর্মপরিকল্পনা সাজাতে হবে। আর তা হলে এই আঞ্চলিক জোটের সদস্য না হয়েও এটি থেকে লাভবান হবে বাংলাদেশ।

SAARC

BIMSTEC

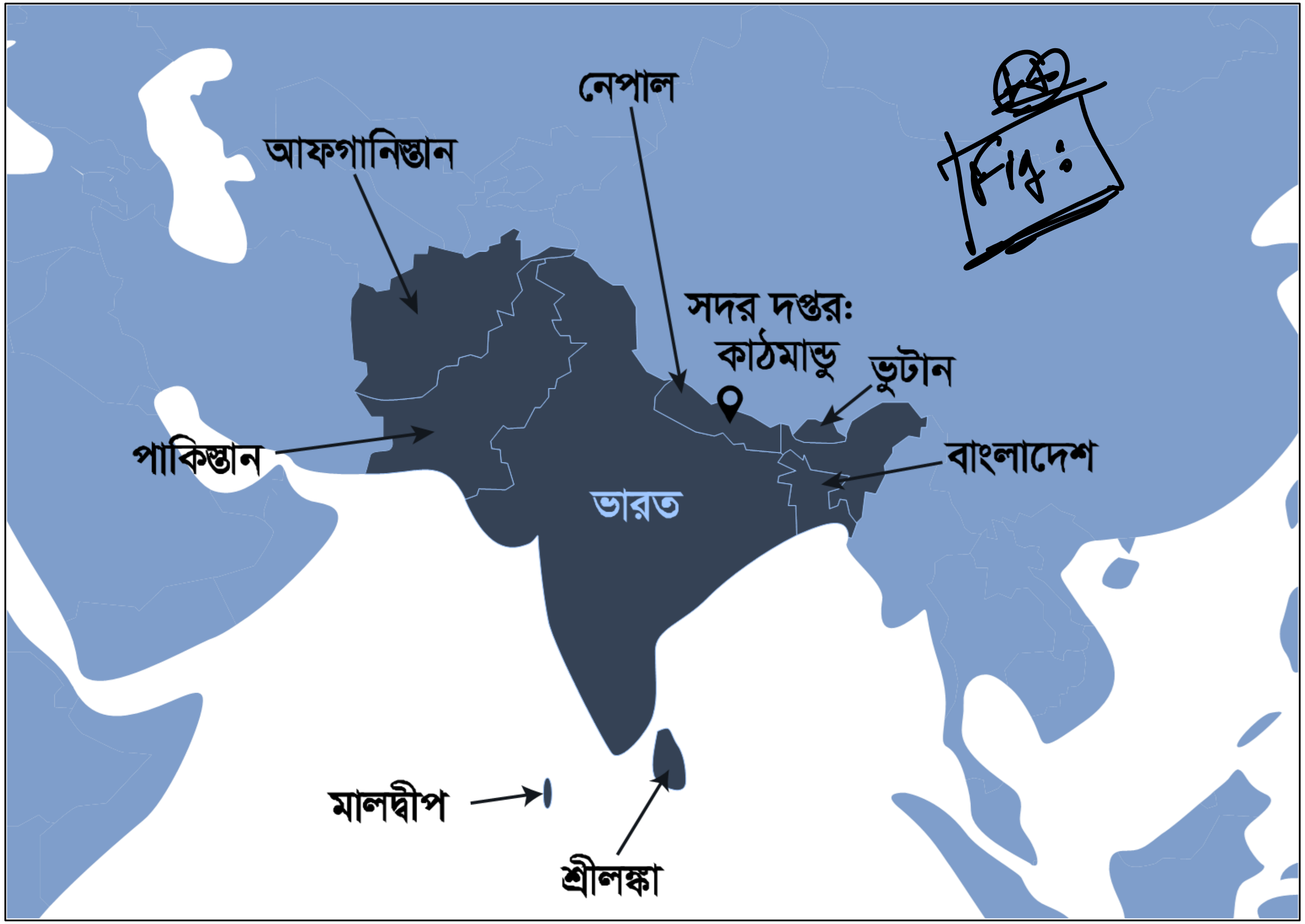

SAARC

সার্কের উদ্দেশ্য (Objectives of SAARC)

সার্ক সনদের ১ অনুচ্ছেদে সার্কের ৮টি উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা:

- দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।
- এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, সামাজিক অগ্রগতি সাধন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং প্রতিটি দেশের স্ব-স্ব মর্যাদা সমুন্নত রেখে সহাবস্থানে সকল প্রকার সুযোগ-সৃষ্টিতে সহায়তা করা।
- সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সমষ্টিগত আত্মনির্ভরশীলতা জোরদার করা।
- পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন, সমঝোতা এবং অন্যের সমস্যা উপলব্ধি করা।
- অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতা বৃদ্ধি।
- অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে সহযোগিতার প্রসার ঘটানো।
- সর্বজনীন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করা।
- আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।

SAARC

সার্কের সহযোগিতার ক্ষেত্র

সার্কের সহযোগিতার ক্ষেত্র মোট ১৩টি। যথা-১. কৃষি, ২. স্বাস্থ্য ও জনসেবা, ৩. ডাক ও টেলিযোগাযোগ, ৪. মাদকদ্রব্য পাচার ও অপব্যবহার রোধ, ৫. আবহাওয়া, ৬. পল্লি উন্নয়ন, ৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ৮. শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া, ৯. যাতায়াত ও পরিবহন, ১০. নারী উন্নয়ন, ১১. পর্যটন, ১২. পরিবেশ ও বন এবং ১৩. দারিদ্র্য বিমোচন।

সার্কের সফলতা

প্রতিষ্ঠালগ্নে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জনসাধারণের কল্যাণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, দ্রুত সমৃদ্ধি অর্জন, সামাজিক অগ্রগতি, সাংস্কৃতিক উন্নয়নসহ এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানো এবং সর্বোপরি প্রতিটি দেশের আর্থ-সামাজিক, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্য নিয়েই গড়ে উঠেছিল দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা 'সার্ক'। এ সংস্থাটি সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সমস্যা সমাধানের এক ধরনের ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে।

SAARC

নিম্নে সার্কের সাফল্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি: এশিয়া মহাদেশের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো সবচেয়ে বেশি অবহেলিত ও বঞ্চিত। এখানে প্রায় ১৯০ কোটি লোকের বাস হলেও তারা কোনোভাবেই উন্নত জীবনের অধিকারী হতে পারছে না। এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে বোঝা হিসেবে বিবেচনা না করে বরং একে যদি সম্পদে পরিণত করা যায় তাহলে এ অঞ্চলটি হয়ে উঠতে পারে একটি সমৃদ্ধিশালী এলাকায়। তাই সার্ক প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিকাশের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা তথা প্লাটফর্ম দাঁড় করানো সম্ভব হয়েছে। এ সংস্থাটির মাধ্যমে এ অঞ্চলের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করার প্রয়াস পেয়েছে।

সন্ত্রাস দমনে ভূমিকা: সার্কের ৮টি দেশের মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও নেপাল সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাস কবলিত। এ সব দেশের সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের পিছনে রাষ্ট্রগুলোর মদদ দানের বিষয় সম্পর্কে রয়েছে পারস্পরিক অভিযোগ। এ অবস্থা নিরসনকল্পে সার্ক সদস্য দেশগুলো সন্ত্রাস দমনে একটি কনভেনশন স্বাক্ষর করেছে। এটি কার্যকর হলে সন্ত্রাস দমনে ৮টি দেশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ও সীমান্তবর্তী সমস্যা নিরসনে ভূমিকা পালন করতে পারবে। এর ফলে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সীমান্তবর্তী সমস্যা কাশ্মীর ইস্যুকে আলোচনার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব।

SAARC

- **সাফ গেমস প্রবর্তন:** সার্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো সাফ গেমস প্রথা প্রবর্তন। প্রতি চার বছর পর এ খেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। সার্কের সদস্যভুক্ত প্রতিটি দেশে পর্যায়ক্রমে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এতে করে তারা পূর্বের মতো নিজেদেরকে একে অপরের শত্রু না ভেবে বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের এক অপূর্ব সুযোগ লাভ করেছে।

- **সাপটা চুক্তি সম্পাদন:** সার্ক দেশগুলোর অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে ১৯৯৩ সালের ১১ এপ্রিল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠনের বিষয়ে সাপটা (South Asian Preferential Trading Arrangement-SAPTA) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০০৬ সাল থেকে সার্ক মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে পদার্পণ করেছে। এর ফলে অর্থনৈতিক সহযোগিতা আগের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

SAARC

- **নারী কল্যাণ:** সার্ক প্রতিষ্ঠার ফলে এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নারীদের কল্যাণের জন্য কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ সংস্থাটি ১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সার্ক কন্যা দশক পালন করেছে। এ ছাড়া সার্কের প্রচেষ্টার ফলে প্রতি বছর ২৪ ডিসেম্বর মীনা দিবস পালিত হয়। এতে করে সার্কভুক্ত দেশগুলোর শিশুরা বিশেষ করে কন্যা শিশুরা নিজেদের মধ্যে সচেতনতা লাভের সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়া ১৯৯০ সালে সার্ক কন্যা শিশু বর্ষ পালন করেছে। শিশুদের পাশাপাশি নারীদের কল্যাণের জন্য সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পতিতাবৃত্তি ও নারী নির্যাতন রোধের জন্য ২০০২ সালের ৫ জানুয়ারি নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এ কনভেনশনে নারী ও শিশুদের কল্যাণের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলা হয়।

- **সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন:** সার্কভুক্ত দেশগুলো ছাত্রদের মধ্যে মেধার লালন ও বিকাশের জন্য সার্ক সদস্যরা ভারতের দিল্লিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে যাতে ২০১০ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ফলিত গণিত, বায়োটেকনোলজি, কম্পিউটার, বিজ্ঞান, উন্নয়ন অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আইন এবং সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী প্রদান করে। সার্কভুক্ত দেশগুলোর শিক্ষার্থীদের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ কোটা আছে।

SAARC

- **সার্ক সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তন:** ২০০০ সালে সার্ক সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। এশীয় দেশগুলোর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য সার্ক সাহিত্য পুরস্কার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ফাউন্ডেশন অব সার্ক রাইটার্স অ্যান্ড লিটারেচার এ পুরস্কারের প্রবর্তন করে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি শামসুর রাহমান প্রথম সার্ক সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

- **বিভিন্ন কনভেনশন ও চুক্তি:** সার্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কনভেনশন ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এসব চুক্তি ও কনভেনশনের ফলে সার্কভুক্ত দেশগুলো সার্ককে শক্তিশালী একটি সংগঠনে পরিণত করার প্রয়াস লাভ করেছে।

সার্কের ব্যর্থতা/চ্যালেঞ্জসমূহ

- সার্কের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের সমস্যাও রয়েছে। একটি বড় ও শক্তিধর দেশ হিসেবে ভারত অন্যান্য দেশগুলোকে সার্কের সমঅংশীদার বলে মনে করে না। সার্ক দেশসমূহের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের অভাব, প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে ভারতের সম্পর্কের তিক্ততা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতা আঞ্চলিক এই জোটের ঐক্য ও সংহতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। এর ফলে বাণিজ্যিক চুক্তিসমূহের ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়েছে। এতে করে সদস্য দেশগুলোকে জোট ও চুক্তির বাইরে এসে একক ও দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগ গ্রহণ করে স্ব স্ব বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করতে দেখা যায়।
- সার্কের দুই দশকের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দক্ষিণ এশিয়ার আর্থ সামাজিক নীতির স্থপতি হিসেবে নয়, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলনের মাধ্যমে আঞ্চলিক আলাপ-আলোচনা উৎসাহিত করার একটি ফোরাম হিসেবেই সার্কের কর্মকান্ড বেশি পরিচিতি লাভ করেছে। একটি আঞ্চলিক সংস্থা বা জোট হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানটি বিকাশ লাভ করতে পারেনি।

SAARC

- সার্কের কাঠামোটি প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক সহযোগিতার অনুকূল নয়। সার্ক শীর্ষ সম্মেলনই হচ্ছে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কর্তৃপক্ষ। শীর্ষ সম্মেলনের অংশীদার যেকোনো একটি দেশ অনীহা প্রকাশ করলে সম্মেলন পণ্ড হয়ে যেতে পারে। কার্যত হয়েছেও তাই। সার্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত ৩৮ বছরে এর সনদ অনুযায়ী ৩৮টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার কথা থাকলেও হয়েছে মাত্র ১৮টি। এর প্রধান কারণ ভারত-পাকিস্তান বিরোধিতা। পরমাণু শক্তিধর এ দু'টি দেশ অস্ত্র প্রতিযোগিতায়ও নেমেছে। পাকিস্তানের মোকাবিলায় ভারত সার্ক এলাকায় বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটানের সমন্বয়ে গঠিত একটি উপ-আঞ্চলিক গ্রুপে (BBIN) যোগদান করেছে। তারা নেপালের সাথে একটি বাণিজ্য ও ট্রানজিট চুক্তিও করেছে। এর প্রভাব এই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে রয়েছে যা সার্ক-এর দর্শনকে দুর্বল করছে।
- সার্কের সনদে কোনো দ্বি-পাক্ষিক বিষয়ে আলোচনার সুযোগ নেই। আবার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়েও কোনো আলোচনার সুযোগ রাখা হয়নি। ফলে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা ও রাজনৈতিক বিষয়াবলির সমস্যার সমাধানে কোনো শান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। অথচ আঞ্চলিক শান্তি ও অগ্রগতির জন্য এ দুটি সমস্যার সমাধান জরুরি।

SAARC

- সার্কের কাঠামোটি প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক সহযোগিতার অনুকূল নয়। সার্ক শীর্ষ সম্মেলনই হচ্ছে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কর্তৃপক্ষ। শীর্ষ সম্মেলনের অংশীদার যেকোনো একটি দেশ অনীহা প্রকাশ করলে সম্মেলন পণ্ড হয়ে যেতে পারে। কার্যত হয়েছেও তাই। সার্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত ৩৮ বছরে এর সনদ অনুযায়ী ৩৮টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার কথা থাকলেও হয়েছে মাত্র ১৮টি। এর প্রধান কারণ ভারত-পাকিস্তান বিরোধিতা। পরমাণু শক্তিধর এ দু'টি দেশ অস্ত্র প্রতিযোগিতায়ও নেমেছে। পাকিস্তানের মোকাবিলায় ভারত সার্ক এলাকায় বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটানের সমন্বয়ে গঠিত একটি উপ-আঞ্চলিক গ্রুপে (BBIN) যোগদান করেছে। তারা নেপালের সাথে একটি বাণিজ্য ও ট্রানজিট চুক্তিও করেছে। এর প্রভাব এই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে রয়েছে যা সার্ক-এর দর্শনকে দুর্বল করছে।
- সার্কের সনদে কোনো দ্বি-পাক্ষিক বিষয়ে আলোচনার সুযোগ নেই। আবার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়েও কোনো আলোচনার সুযোগ রাখা হয়নি। ফলে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা ও রাজনৈতিক বিষয়াবলির সমস্যার সমাধানে কোনো শান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। অথচ আঞ্চলিক শান্তি ও অগ্রগতির জন্য এ দুটি সমস্যার সমাধান জরুরি।
- দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের সার্বিক উন্নতি ত্বরান্বিত করার প্রত্যয় নিয়ে সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু পারস্পরিক অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতার অভাবে এ সংস্থাটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিংবা আসিয়ানের ন্যায় অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়নি।
- দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে পারস্পরিক সহযোগিতার যে প্রত্যাশা নিয়ে সার্ক যাত্রা শুরু করেছিল বাস্তবে সে প্রত্যাশা পূরণে সার্ক ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তান ভারতের বিরোধ মীমাংসা হয়নি বরং বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দুই দেশের বৈরী সম্পর্কের কারণে সার্ক একটি অকার্যকর সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

SAARC

সার্ককে কার্যকর করতে করণীয়

সস্তা শ্রমশক্তি, সস্তা কাঁচামাল, উর্বর কৃষিভূমি ও অনুকূল পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে আঞ্চলিক উন্নয়ন ও বাইরের অর্থনৈতিক আগ্রাসন মোকাবিলার জন্য সার্কের সূচনাও এই অঞ্চলের মানুষের মনে একটি অঙ্গীকারের সূচনা করেছিল। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান Cross Cultural Conflict এর শিকার হয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি তার অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে সার্ককে তৎপর ও শক্তিশালী করতে হলে নিম্নোক্ত দু'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

- সার্ক সনদ সংশোধন করে সার্কের বিদ্যমান শীর্ষ সম্মেলনকে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট করা জরুরি। এর উচ্চতর কক্ষে থাকবে সকল সদস্য দেশ এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সামগ্রিক অগ্রগতির মূল্যায়ন ও পরিধারণ হবে তার কাজ। সামিট এর নিম্ন কক্ষে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব থাকবে না। এই কক্ষের সদস্য দেশগুলো বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন এবং বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি বছর একবার শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হবেন। শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য সকল দেশের ১০০ ভাগ সম্মতির বিধানটিও রহিত করতে হবে। ভারতীয় আধিপত্য ও ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বকে যদি সার্কের কাঠামোতে গৌণ করে তোলা যায় তা হলে এই প্রতিষ্ঠানটির গতিশীলতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

SAARC

- উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সার্ক দেশগুলো ইইসি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং সমবায়সহ স্ব স্ব দেশের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজে লাগাতে পারে। এক্ষেত্রে ‘সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে’- এই নীতির অনুসরণে সার্ক বহির্ভূত দেশসমূহের পরিবর্তে তারা তাদের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য যথাসম্ভব নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ও সম্প্রসারিত করার পদক্ষেপ নিতে পারে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান Tariff ও Non-Tariff বাধাসমূহ অবশ্যই দূর করতে হবে। ভারত-পাকিস্তান যদি এক্ষেত্রে অন্যান্য সদস্য দেশগুলোর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চায় আপত্তি নেই। তবে তারা যাতে বাধা না হতে পারে সে জন্যই সনদ সংশোধন জরুরি।

BIMSTEC

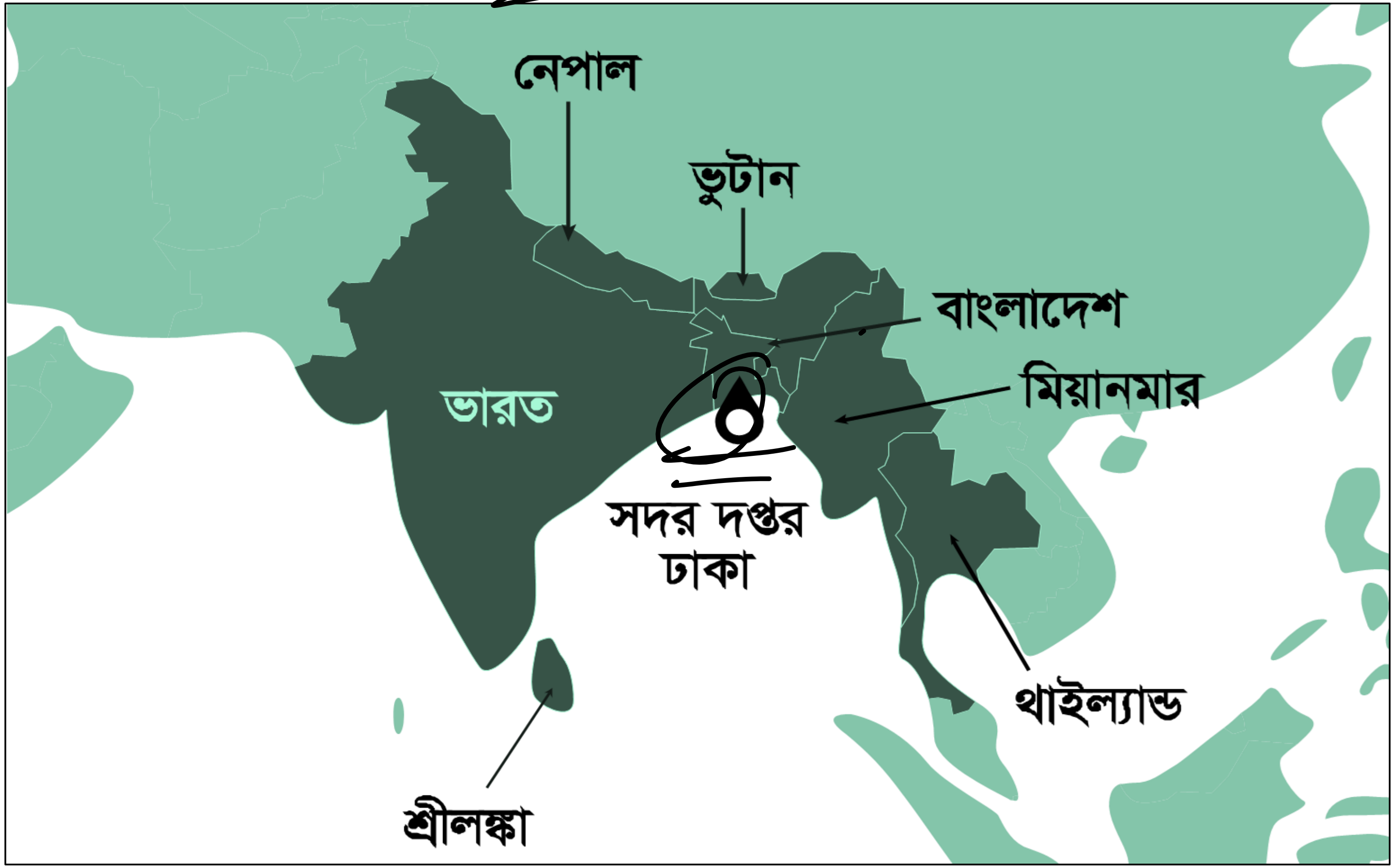

BIMSTEC-এর অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্র

অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্র	দায়িত্বপ্রাপ্ত দেশ
১. ব্যবসা ও বাণিজ্য	**বাংলাদেশ**
২. জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা	
৩. পরিবহন ও যোগাযোগ	ভারত
৪. পর্যটন	
৫. সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও আন্তঃসীমান্ত অপরাধ মোকাবেলা	
৬. পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	
৭. মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা	থাইল্যান্ড
৮. জনস্বাস্থ্য	
৯. জনসংযোগ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ	
১০. প্রাকৃতিক সম্পদ খাতে	মিয়ানমার
১১. কৃষি খাতে	
১২. প্রযুক্তি খাতে	শ্রীলংকা
১৩. দারিদ্র্য দূরীকরণে	নেপাল
১৪. সংস্কৃতিতে	ভুটান

ASEAN

মিয়ানমার
লাওস
ভিয়েতনাম
থাইল্যান্ড
ব্রুনাই
ফিলিপাইন
কম্বোডিয়া
মালয়েশিয়া
সিঙ্গাপুর
ইন্দোনেশিয়া
সদর দপ্তর
জাকার্তা

ASEAN

আসিয়ানের সাফল্য

- আসিয়ান আদৌ সফল হয়নি এমন কথাও বলা যায় না। ১৯৯১ সালে আসিয়ানের তৎপরতায় কম্বোডিয়ার শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আসিয়ান দেশগুলোর এটি একটি বিরাট সাফল্য।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নকে অনুসরণ করে আসিয়ানভুক্ত দেশসমূহ ১৯৯২ সালে সাধারণ কার্যশীল অগ্রাধিকারসম্পন্ন শুল্ক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলপ্রসুতা বিশ্লেষণ করে ১৯৯২ সালের ২৮ জানুয়ারি সদস্যদেশ সমূহ আসিয়ান মুক্ত বাণিজ্য এলাকা (AFTA) চুক্তিতে উপনীত হয়। চুক্তির মাধ্যমে এই সময়ে এসব সদস্য দেশে পারস্পরিক আমদানি রপ্তানি খাতে আরোপিত শুল্ক শতকরা ৪ ভাগ কমিয়ে আনা হয়েছে।
- ১৯৯৪ সালে আসিয়ান একটি ফোরাম গঠন করে, নাম দেওয়া হয় ASEAN Regional Forum. উদ্দেশ্য এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা সুদৃঢ় করা। আমেরিকা এই অঞ্চলের নিরাপত্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।
- ১৯৯৭ সালের ২৮ মার্চ আসিয়ানভুক্ত সকল দেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত এলাকা বলে ঘোষণা করে। এই চুক্তি ২০০১ সালে ২১ জুন ফিলিপিন্স কর্তৃক অনুসমর্থিত হলে এ এলাকায় সকল প্রকার পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়।
- ২০০৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর আসিয়ানভুক্ত সকল দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্প্রদায়ের মতো আর্থিক ও রাজনৈতিক এলাকায় রূপান্তরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়।
- ২০১৬-এর ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ওবামা সানিল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্র ও আসিয়ানের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন। এই সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা সংবলিত করে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সংশ্লিষ্ট খাতে একটি বিস্তৃত সংগঠন গঠনের ডাক দেয়া হয়। এর ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে প্রস্তাবিত ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ (টিপিপি) স্থাপন ও প্রসারণ সহজতর করার সমষ্টিগত উদ্যোগ গৃহীত হয়।

ASEAN

আসিয়ানের ব্যর্থতা

- আসিয়ান দেশসমূহে বিশেষত মিয়ানমারে মানবাধিকার ও গণতন্ত্র উন্নয়নে ফলদায়ী তেমন কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। মিয়ানমারে উন্মুক্ত ও প্রচ্ছন্ন সামরিক শাসক কর্তৃক জনগণের অধিকার রক্ষাকরণ এবং তাদের উপর নির্যাতনের প্রতিকূলে আসিয়ান জোট চোখে পড়ার মতো কোন পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়নি। রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানেও কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি আসিয়ান।
- আসিয়ানের সদস্য দেশসমূহ রাজনৈতিক কাঠামোর বিভিন্নতার কারণে তাদের ঐক্য অধিকতর দৃঢ় করতে সক্ষম হয়নি। যেমন, তারা একদিকে মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডের মাঝে এবং অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মাঝে বিদ্যমান সীমান্ত বিরোধ মেটাতে সক্ষম হয়নি। তেমনি থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার সীমান্ত বিরোধ এবং ফিলিপিন্সে কতিপয় রাজনীতিবিদ কর্তৃক উত্থাপিত স্বাধিকার সম্পর্কিত দাবির কোন সুরাহা এখনো করা সম্ভব হয়নি।
- দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের বিপরীতে ফিলিপিন্স কর্তৃক উত্থাপিত অধিকার বিষয়ক দাবি বা বিরোধ মেটানোর লক্ষ্যে আসিয়ান জোট কোন পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়নি।
- আসিয়ান জোট সমবেতভাবে তাদের স্ব-স্ব দেশে কার্যরত রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের বিদিত দুর্নীতি দমন সম্পর্কে কোন ঐকমত্যভিত্তিক পদক্ষেপ নিতে পারেনি।
- দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে শান্তিপূর্ণ স্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার কথা থাকলেও চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের চাপে এখনো 'Zone of Peace' ঘোষণা করতে পারেনি।

ARF

২৫ জুলাই, ১৯৯৪ সালে আসিয়ান একটি ফোরাম (Forum) গঠন করে, নাম দেওয়া হয় ASEAN Regional Forum (ARF). এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার জন্য ARF গঠন করা হয়। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৭। বাংলাদেশ এর ২৬তম সদস্য দেশ। ২০০৬ সালের ২৮ জুলাই বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে। ARF এর সর্বশেষ (২৭তম) সদস্য রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা। সদস্য পদ লাভ ১ আগষ্ট, ২০০৭ সালে। ARF-এর সদর দপ্তরও ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অবস্থিত। আমেরিকা এই অঞ্চলের নিরাপত্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

OIC

OIC প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

- ১৯৬৭ সালের ৫ জুন ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করে তৃতীয় আরব ইসরাইল যুদ্ধ শুরু হয়। মিসর, সিরিয়া ও জর্ডানের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধে ইসরাইল বেশ কিছু আরব ভূমি দখল করে নেয়।
- নিরাপত্তা পরিষদের আহ্বানে ১০ জুন, ১৯৬৭ এ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এরপর ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট ইসরাইল জেরুজালেমে অবস্থিত মুসলমানদের প্রথম কাবা মসজিদ আল আকসায় অগ্নিসংযোগ করে। ফলে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক বিক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।
- সে বছরই ২৫ আগস্ট কায়রোতে ১৪টি আরব দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে সৌদি আরব প্রস্তাব দেয় যে "বিষয়টি শুধু আরব নয়, গোটা ইসলামি বিশ্বের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এ বিষয়ে আলোচনার জন্য অবিলম্বে মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া অপরিহার্য"। উপস্থিত অন্যান্য দেশের পররাষ্ট্রন্ত্রীগণ তাতে পূর্ণ সমর্থন জানান এবং সৌদি আরব, মরক্কো, ইরান, পাকিস্তান, সোমালিয়া, নাইজেরিয়া ও মালয়েশিয়াকে নিয়ে একটি শীর্ষ সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়।
- পরের মাসে অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বরের ৮-৯ তারিখে এ কমিটির সদস্যগণ মরক্কোর রাজধানী রাবাতে মিলিত হয়ে শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করে।
- সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯, ২২ থেকে ২৫ তারিখে রাবাতে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং শীর্ষ সম্মেলনের শেষ দিনে ২৪টি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের অংশগ্রহণে আনুষ্ঠানিকভাবে OIC প্রতিষ্ঠিত হয়।
- প্রথম ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ২২-২৭ মার্চ পর্যন্ত জেদ্দায় মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট্রন্ত্রীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২২টি দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দেয়। এ সম্মেলনেই OIC গড়ে তোলার পথ উন্মুক্ত হয়।
- সম্মেলনে একটি ইসলামি সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং জেরুজালেম মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তা জেদ্দায় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মালয়েশিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী টেংকু আব্দুর রহমান প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত হন।

OIC

❖ OIC-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

১. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামিক সংহতি বৃদ্ধি করা।

২. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতা সংহত করা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করা এবং নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা।

৩. বর্ণবৈষম্যসহ সকল প্রকার বৈষম্য ও উপনিবেশবাদ উচ্ছেদের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো।

৪. ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি সমর্থন দান।

৫. মুসলিম জনগোষ্ঠীর মর্যাদা, স্বাধীনতা ও জাতিগত অধিকার রক্ষায় সহযোগিতা প্রদান।

❖ OIC-এর সফলতা

১. মুসলমানদের যে জাতিগত ও ধর্মীয় ঐক্য বিদ্যমান, OIC তার একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি রচনা করে। OIC-এর সদস্যরাষ্ট্রগুলো তাদের শত বিভক্তি থাকা সত্ত্বেও এ প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে তাদের ঐক্যবদ্ধ ও বিশিষ্ট অস্তিত্বের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে।

২. এ সংগঠনটি বিভিন্ন সময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেকোনো নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আসছে। এ প্রতিবাদ কার্যকর প্রমাণিত না হলেও মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার একমাত্র আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে এর গুরুত্ব রয়েছে।

৩. বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য OIC বিভিন্ন সময় প্রতিবাদ প্রস্তাব, কমিটি গঠনসহ নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

OIC

❖ OIC-এর ব্যর্থতা

১. OIC এর সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলো ১৯৬৭ সালে ইসরায়েল কর্তৃক দখলকৃত জেরুজালেম শহর ও অন্যান্য ভূ-খণ্ড উদ্ধারে ও সম্প্রসারণবাদী ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণে ব্যর্থতা। ইসরায়েলের পারমাণবিক কর্মসূচির বিরুদ্ধেও OIC কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি।

২. কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। বসনিয়া-হার্জেগোভিনা সংকট, চেচনিয়া সংকট প্রভৃতি সমস্যার সমাধানে OIC কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। লেবানন ও আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধ বন্ধে ও OIC ব্যর্থ।

৩. বিশ্বব্যাপী মুসলিম নির্যাতনের বিষয়ে OIC সর্বদা নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে আসছে। আমেরিকা, আফগানিস্তান ও ইরাকে সন্ত্রাসী হামলা করে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। সেক্ষেত্রেও OIC কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি। উপসাগরীয় অঞ্চল, পশ্চিম সাহারা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে পশ্চিমা সেনাবাহিনী মোতায়েনের বিরুদ্ধে OIC কোনো প্রতিবাদ জানায়নি।

৪. মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও OIC পুরোপুরি ব্যর্থ। মুসলমানদের হাতে মূল্যবান তেল সম্পদ থাকার পরও তারা তাদের তেলের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না. সেক্ষেত্রে OIC কেনো সমন্বিত উদ্যোগ নিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

NATO

❖ সদস্য দেশসমূহ-

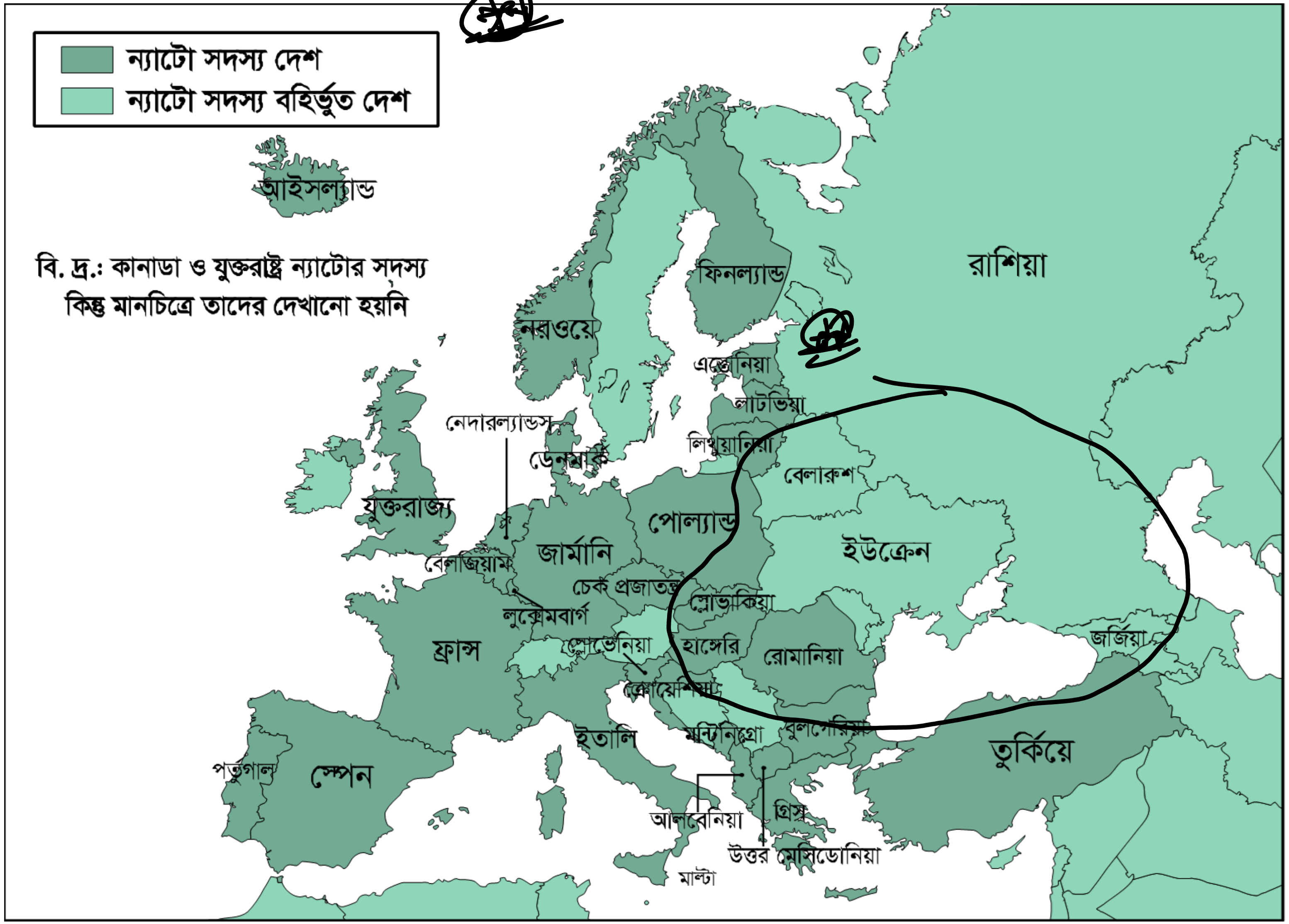

NATO এর উদ্দেশ্যসমূহ

- আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার রক্ষার স্বার্থে শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মধ্যে যাবতীয় বিবাদ-বিরোধের মীমাংসা করা।
- পারস্পরিক অর্থনৈতিক সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন।
- জোটভুক্ত দেশসমূহের কোনো একটি বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে অপরাপর রাষ্ট্রগুলো একে নিজেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে গণ্য করবে এবং যতদিন পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদ আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেবে ততদিন নিজেরা যৌথভাবে তা প্রতিরোধের প্রচেষ্টা চালাবে।
- চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের নিকট সকল বিষয়ে নিয়মিত রিপোর্ট পেশ করবে এবং প্রয়োজনে নিরাপত্তা পরিষদকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।
- যেকোনো রাষ্ট্র সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সর্বসম্মতিতে এ সংস্থার সদস্য হতে পারবে।

NATO এর সম্প্রসারণ

১৯৪৯ সালে মাত্র ১২টি দেশ নিয়ে NATO শুরু হলেও কালের পরিক্রমায় বর্তমানে ন্যাটোর মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩১ এ। এভাবে নতুন নতুন দেশকে অন্তর্ভুক্ত করে NATO এর কলেবর বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বলে ন্যাটোর সম্প্রসারণ। এক নজরে ন্যাটোর সম্প্রসারণের ধাপগুলো হলো:

- ✓ ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিল ১২টি দেশ; যথা: বৃটেন, ইতালি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, নরওয়ে, পর্তুগাল, আইসল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা।
- ✓ ১৯৫২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি সদস্য হয় গ্রিস ও তুর্কিয়ে।
- ✓ ১৯৫৫ সালের ৯ মে সদস্য হয় পশ্চিম জার্মানি (বর্তমান জার্মানি)।
- ✓ ১৯৮২ সালের ৩০ মে স্পেন সদস্য হয়।
- ✓ ১৯৯৯ সালে পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও চেক প্রজাতন্ত্র যোগ দিলে মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯-এ। এ তিনটি দেশ ছিল পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশ।
- ✓ ২০০৪ সালে লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, স্লোভাকিয়া, স্লোভানিয়া, বুলগেরিয়া ও রুমানিয়াসহ ৭টি পূর্ব ইউরোপের দেশ যোগ দিলে মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬টি।

NATO এর সম্প্রসারণ

- ✓ ২০০৮ সালে আলবেনিয়া ও ২০১৩ সালে ক্রোয়েশিয়া যোগ দিলে ন্যাটোর সদস্য সংখ্যা হয় ২৮ টি।
- ✓ ২০১৭ সালে মন্টিনিগ্রো এবং ২০২০ সালে সর্বশেষ উত্তর মেসিডোনিয়া NATO এর সদস্য হওয়া মোট সদস্য সংখ্যা হয় ৩০টি।
- ✓ ২০২৩ সালে ন্যাটোর ৩১তম সদস্য হিসেবে যোগদান করে ফিনল্যান্ড।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিরোধ করতে NATO গঠিত হলেও বর্তমানে পূর্ব ইউরোপের প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো এখন ন্যাটো জোটের সদস্য। অপরদিকে ন্যাটোর সুদূরপ্রসারী সম্প্রসারণের কথা মাথায় রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মতো দেশগুলোকেও NATO এর বাইরে অন্যতম প্রধান মিত্র দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর বাইরে ন্যাটোর সামরিক বাহিনী ইন্দোনেশিয়ায় কাজ করেছে। অদূর ভবিষ্যতে NATO যে আরো সম্প্রসারিত হবে, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

NATO এর সম্প্রসারণ নয়, প্রয়োজন রূপান্তর

১৯৪৯ সালে যে উদ্দেশ্য নিয়ে ন্যাটো গঠিত হয়েছিল, আজ এতগুলো বছর পর তার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে বলে অনেক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং ১৯৯১ সালে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সামরিক জোট Warsaw Pact- এর বিলুপ্তি ন্যাটোর প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিল। কিন্তু বিগত বিশ বছরে ন্যাটো তার কার্যক্রম বিন্দুমাত্র সংকুচিত না করে তা বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ করেছে।

অথচ বর্তমানে দুই পরাশক্তির মধ্যকার ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসান হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির ফলে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে কমিউনিজমের বিস্তৃতির আশংকাও নেই। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে রাশিয়ার সংঘর্ষের আশংকা নেই বললেই চলে। পশ্চিম ইউরোপ থেকে যুক্তরাষ্ট্র এবং পূর্ব ইউরোপ থেকে রাশিয়া তাদের মোতায়েনকৃত ক্ষেপণাস্ত্রও তুলে নিয়েছে। ফলে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কামুক্ত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া দুই পরাশক্তিই বর্তমানে নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তারা ইতোমধ্যে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নির্মূল চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। যেখানে তারা গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র ধ্বংস করছে, সেখানে NATO এর মতো সামরিক জোটের অস্তিত্ব অপ্রয়োজনীয়।

//

NATO এর সম্প্রসারণ নয়, প্রয়োজন রূপান্তর

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, NATO এখন একটি প্রচুর ব্যয়বহুল এক শ্বেত হস্তীর ন্যায় যুদ্ধবাজ সমিতিতে পরিণত হয়েছে যা তার মূল কার্যক্ষেত্র উত্তর আটলান্টিক ছেড়ে বহুদূরে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। সন্ত্রাস দমন করতে এই জোট মধ্য এশিয়ার আফগানিস্তানে এসে যুদ্ধ শুরু করেছে। সেখান থেকে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ইরাক, লিবিয়া বা সিরিয়াতে- এসব প্রতিটি স্থানই উত্তর আটলান্টিক থেকে অনেক দূরে। কমিউনিস্ট আগ্রাসনের কোনো চিহ্ন সেখানে ছিল না। আর যেসব সন্ত্রাসী দমনে NATO এর মতো এক বিশাল সমরাস্ত্রের বহর নিয়ে বড় বড় অভিযান করছে তা একেবারেই বেমানান। এতসব যুদ্ধের তোড়জোড়ের ফলে বিশ্বের সাম্প্রতিক সমস্যাগুলো সমাধানের চেয়ে সমস্যা দীর্ঘায়িত করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় বেশি। এতগুলো দেশ ধ্বংস হওয়ার বা এত সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কোনো প্রয়োজন ছিল না। সামরিক জোটটির গত কয়েক দশকের এসব কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে NATO প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা এখন আর নেই। এ উপলব্ধি আমলে নিলে হয় NATO কে তার প্রতিপক্ষ Warsaw Pact এর মতো বিলুপ্ত করা উচিৎ। নয় তো তাকে সন্ত্রাস প্রতিরোধমূলক অন্য ধরনের এক বাহিনীতে পরিবর্তিত করতে হবে। যাতে করে NATO একটি যুদ্ধবাজ বাহিনীর বদলে উচ্চতর সেনা নায়কদের অধীনে একটি নতুন সন্ত্রাস প্রতিরোধমূলক মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে রূপান্তরিত হয়ে উঠতে পারে। নতুন যুদ্ধ শুরু করা বা যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার পরিবর্তে NATO যেন চলমান যুদ্ধ বন্ধ করতে বা নতুন যুদ্ধ শুরু না করার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। NATO যত বেশি মানবিক এবং আন্তঃদ্বন্দ্বমূলক সংঘাত নিরসনে সহায়ক হবে তত দ্রুত তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। অতএব, বলা যায় যে- NATO এর বিলুপ্তি বর্তমান বাস্তবতায় সম্ভব না হলেও এর সম্প্রসারণের চেয়ে গুণগত রূপান্তর একান্ত প্রয়োজন।

APEC

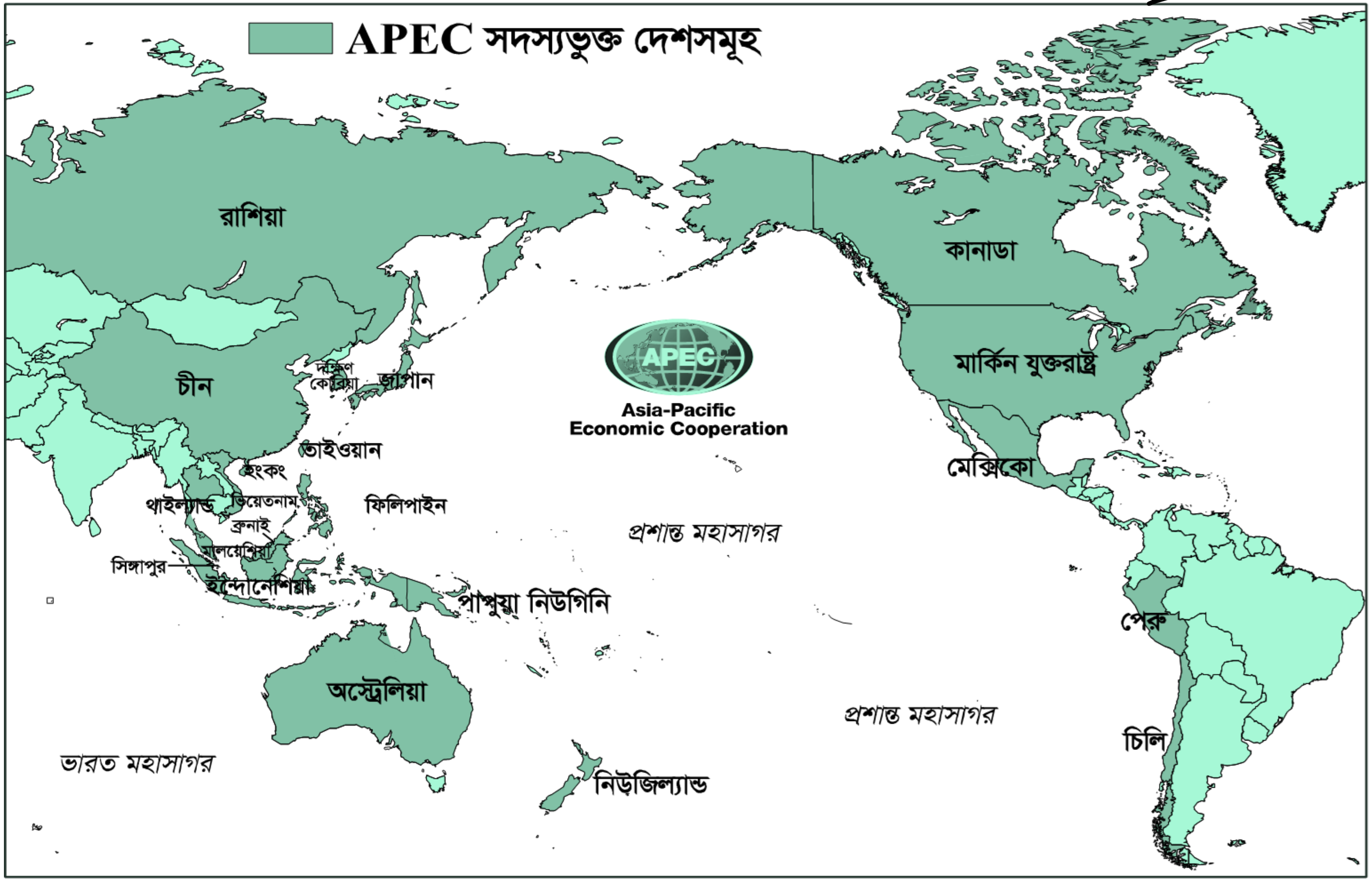
APEC সদস্যভুক্ত দেশসমূহ
রাশিয়া
চীন
দক্ষিণ কোরিয়া
জাপান
তাইওয়ান
হংকং
থাইল্যান্ড
ভিয়েতনাম
ব্রুনাই
ফিলিপাইন
মালয়েশিয়া
সিঙ্গাপুর
ইন্দোনেশিয়া
পাপুয়া নিউগিনি
অস্ট্রেলিয়া
নিউজিল্যান্ড
ভারত মহাসাগর
প্রশান্ত মহাসাগর
প্রশান্ত মহাসাগর
APEC
Asia-Pacific
Economic Cooperation
কানাডা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
মেক্সিকো
পেরু
চিলি

APEC

APEC গঠনের লক্ষ্য

অন্যান্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার ন্যায় কতিপয় নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে APEC গঠিত হয়েছিল। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হলো:

- APEC এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো সহযোগী দেশগুলোর মধ্যে অবাধ বাণিজ্য গড়ে তোলা, যেখানে ট্যারিফের মতো প্রতিবন্ধকতাগুলো থাকবে না।
- বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সহজীকরণের জন্য এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা APEC এর আরেকটি প্রধান লক্ষ্য।
- এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহের মাঝে পারস্পরিক প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বৃদ্ধি করে এবং আঞ্চলিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের মাধ্যমে পণ্য, সেবা ও মূলধনের অবাধ বাজার সৃষ্টি করে অর্থনীতিকে গতিশীল করা এবং কমিউনিটির বন্ধন বৃদ্ধি করা।

APEC

APEC এর লক্ষ্য পূরণে বাস্তবতা/প্রতিবন্ধকতা

সদস্য দেশসমূহে অবাধ বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক প্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে APEC গঠিত হলেও কিছু কারণে তার লক্ষ্য অর্জনে প্রতিকূল বাস্তবতার সম্মুখীন হচ্ছে। নিম্নে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো:

- **প্রভাবশালী দেশগুলোর আধিপত্য :** APEC জোটভুক্ত কিছু দেশ বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়ানক হিসেবে বিবেচিত। সুতরাং তারা যে APEC এর কর্মকাণ্ডে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করবে, সেটাই স্বাভাবিক। বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন বর্তমানে বিশ্বের দুই অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়ে বিশ্বব্যবস্থার উপর একক আধিপত্য বিস্তার করেছে। একইভাবে এরকম প্রভাবশালী দেশগুলো APEC এর অন্য সদস্যদেরকেও তাদের একক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের উপর সম্মতি প্রদানের জন্য ব্যাপক প্রভাবিত করছে। ফলে সামগ্রিক ও সুষম উন্নয়নের যে লক্ষ্য নিয়ে APEC গঠিত হয়েছিল তা ব্যাহত হচ্ছে।

APEC

অবাধ বাণিজ্যে অসমতা : APEC ভুক্ত দেশসমূহের মাঝে অবাধ বাণিজ্য ও মূলধন প্রবাহের সুবিধা সকল সদস্য রাষ্ট্র সমানভাবে উপভোগ করতে পারছে না। কেননা উন্নত দেশগুলো অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে তাদের শিল্প, বাণিজ্য, প্রযুক্তি প্রসারের রাস্তাকে আরও ত্বরান্বিত করছে। কিন্তু তুলনামূলক উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো উন্নত দেশগুলোর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রচুর উৎপাদনশীলতা ও মূলধনের প্রবাহের কাছে মাথানত করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে সাম্প্রতিক সময়ে APEC ভুক্ত অনুন্নত দেশসমূহে দারিদ্র্যের হার কিছুটা হ্রাস পেতে শুরু করলেও এখানে এখনও রাষ্ট্র সীমানার জটিলতার ঊর্ধ্বে সব দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত জটিলতা, বেকারত্ব ইত্যাদি দূর না হওয়ার ফলে এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ফিরে আসেনি। তাই বলা যায়, APEC এর গৃহীত অবাধ বাণিজ্য কর্মসূচি স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য এক ধরনের সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

APEC

অসামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা : অর্থনৈতিক জোট হিসেবে APEC এর আরেকটি সীমাবদ্ধতা হলো এর সদস্য দেশগুলোর বহুমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। যেমন, এর অন্যতম শক্তিশালী সদস্য চীন ও রাশিয়ার অর্থনীতির মূল ধারণা সমাজতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ দুটি রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিবর্তে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু করলেও তা সর্বাংশে প্রয়োগ হচ্ছে না। আবার এর আরেকটি প্রভাবশালী সদস্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উপর দাঁড়ানো বিশ্বের একক পরাশক্তি। সে তার নিজস্ব পুঁজিবাদী বলয়কে আরও প্রভাবশালী করে তোলার লক্ষ্যে দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক জোট প্রতিষ্ঠিত হোক তা কখনো চায় না। ফলে APEC এর পক্ষে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো কোনো সুগঠিত কর্মসূচি নেওয়া বা ইউরোর মতো এটি একক মুদ্রা চালু করা সম্ভব হয়নি।

APEC

- **নিজস্ব এজেন্ডা প্রণয়নে ব্যর্থতা :** এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবাধ অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক অঞ্চল গড়ে উঠার ব্যাপারে APEC এ অঞ্চলের জনগণের সামনে কোনো সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা হাজির করতে পারেনি। প্রতিবছর এপেকের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও তাতে উল্লেখযোগ্য কোনো এজেন্ডা থাকে না। উল্টো তারা অনেক সময় নিজেরা কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে বরং অন্য কোনো বৈশ্বিক সংস্থার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তৎপরতা দেখায়। যেমন, ১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে কানাডার ভ্যাংকুভারে যখন APEC শীর্ষ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ মিলিত হয়েছিলেন তখন এশিয়ায় অর্থনৈতিক মন্দা চলছিল কিন্তু তারা তা দূর করার জন্য নিজেরা কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেননি বরং মন্দা দূরীকরণে IMF এর নির্দেশাবলি অনুসরণ জোরদার করার সুপারিশ করেন। এছাড়াও অনেক সময় এ সংস্থাটি বিশ্ব ব্যাংকের কর্মসূচি বাস্তবায়নের নানা সুপারিশ গ্রহণ করেছে। এসব বৈশ্বিক সংস্থার নিজস্ব এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অনেক সময় পিছিয়ে থাকা সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণ সম্ভব হয় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, APEC এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের একটি বৃহৎ জোট হওয়া সত্ত্বেও এটি কার্যত কোনো সফল কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসেনি যাতে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। একটি অর্থনৈতিক জোট হিসেবে APEC এর শীর্ষ নেতৃবৃন্দের উচিত হবে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থাকে সামনে রেখে বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করা। বিশ্ব খাদ্য সংকট, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা, পরিবেশগত উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের উত্থান ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যদি তারা বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন তাহলে প্রতিবছর শুধু সম্মেলনের আয়োজন করে প্রতিষ্ঠানটি কেবল একটি কাগুজে বাঘেই পরিণত হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

GCC

➲ GCC এর পূর্ণরূপ Gulf Co-operation Council. পারস্য উপসাগরীয় এলাকার ৬টি রাষ্ট্র নিয়ে এ সংস্থা গঠিত। ১৯৭৯ সালে ইরানে আয়াতুল্লাহ খোমেনির ইসলামি বিপ্লবের পর নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ১৯৮১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি এ সংস্থা গঠন করা হয়।

➲ এর ৬টি সদস্য রাষ্ট্রসমূহ হলো- সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, ওমান, কুয়েত এবং আরব আমিরাত। এর সদর দপ্তর সৌদি আরবের রিয়াদে অবস্থিত এবং এর বর্তমান মহাসচিবের নাম নায়েফ বিন ফালাহ আল হাজরাফ (কুয়েত)। GCC কে আরব দেশসমূহের সরকার প্রধানদের নিয়ে গঠিত একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী সংস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়।

❖ GCC এর লক্ষ্যসমূহ

- ধর্ম, অর্থ, বাণিজ্য, রীতিনীতি, পর্যটন, আইন এবং প্রশাসনের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রসমূহে অনুরূপ বিধিবিধান প্রণয়ন।
- শিল্প, খনন, কৃষি, পানি এবং প্রাণিসম্পদে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বাড়ানো।
- বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।
- যৌথ ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ।
- সম্মিলিত সামরিক বাহিনী গঠন (Peninsula Shield Force)
- বেসরকারি খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা।
- সদস্য রাষ্ট্রসমূহের নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করা।

GCC এর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সমূহ

ক. **Supreme Council:** এটি GCC-এর সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পরিষদ, সদস্য দেশগুলির প্রধানদের সমন্বয়ে এটি গঠিত। GCC এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই পরিষদই নির্ধারণ করে।

খ. **Ministerial Council:** এটি সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত। এর সদস্যরা প্রতি তিন মাস পরপর একবার সম্মেলন করে। এটি প্রাথমিকভাবে নীতিমালা তৈরি করে এবং চলমান প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য সদস্য দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা এবং সমন্বয় সাধনের কাজ করে।

গ. **Secretariat General:** GCC সচিব এই সংস্থার নির্বাহী বা প্রাশাসনিক কর্মকর্তা। তিনি তার কর্তৃত্বের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সুপ্রিম বা মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদিত সিদ্ধান্ত কার্যকর করে। GCC এর বর্তমান সেক্রেটারি-জেনারেল হলেন নয়েফ ফালাহ মোবারক আল হাজরাফ এবং তার ডেপুটিদের মধ্যে অন্যতম হলেন আব্দুল আজিজ আল আওইশিগ এবং খলিফা আলফাদেল।

ঘ. **Monetary Council:** ২০০৯ সালে সৌদি আরব, বাহরাইন, কুয়েত ও কাতার এর উদ্যোগে অভিন্ন মুদ্রা প্রচলনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মুদ্রা পরিষদ ৩০ শে মার্চ ২০১০ তারিখে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং অভিন্ন মুদ্রা শাসনব্যবস্থা নির্বাচনের জন্য সময়সূচি এবং কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য এই পরিষদ প্রথমবারের মতো বৈঠক করে।

ঙ. **Patent Office:** GCC এর পেটেন্ট অফিসটি ১৯৯২ সালে অনুমোদিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয় সৌদি আরবের রিয়াদে। এই অফিস সমস্ত GCC এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পেটেন্ট এর বৈধতা মঞ্জুর করে।

চ. **Peninsula Shield Force:** এটি GCC-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলিত সামরিক বাহিনী। সদস্য দেশগুলির যে কোনোটির বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের সামরিক আগ্রাসন প্রতিরোধ এবং প্রতিক্রিয়া জানানোর উদ্দেশ্যে এটি ১৯৮৪ সালে ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত হয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)

BREXIT

EU গঠনের পটভূমি

১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিল সর্বপ্রথম একটি 'যুক্তরাষ্ট্রীয় ইউরোপ'-এর ধারণা দেন। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কাউন্সিল অব ইউরোপ'। এর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ইউরোপের উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করা, মানবাধিকার ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখা। অন্যদিকে, ইউরোপের অর্থনৈতিক সহযোগিতার লক্ষ্যে ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল "ইউরোপিয়ান কোল অ্যান্ড স্টিল কমিউনিটি (ECSC)। প্রতিষ্ঠাকালে এর সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৬। এগুলো হচ্ছে- বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, লুক্সেমবার্গ ও নেদারল্যান্ড। এর উদ্দেশ্য ছিল সংস্থার আওতায় নিজ নিজ দেশের সব কয়লা উত্তোলনে ও ইস্পাত উৎপাদনে পারস্পরিক সহযোগিতা করা। ১৯৫৭ সালে রোমে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে ECSC এবং কাউন্সিল অব ইউরোপ একীভূত হয়ে ১৯৫৮ সালের ১ জানুয়ারি 'ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি" (EEC) নামে আত্মপ্রকাশ ঘটে। EEC ইউরেটম এবং ECSC সম্মিলিতভাবে European Communities (EC) নাম ধারণ করে ১৯৬৭ সালে। পরে ১৯৭৩ সালে বৃটেন, ডেনমার্ক ও আয়ারল্যান্ড এ জোটে যোগদান করে। EC কে ব্যাপক রূপ দেওয়ার জন্য ম্যাসট্রিক্ট চুক্তির মাধ্যমে ১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি EC রূপান্তরিত হয়ে EU (ইউরোপীয় ইউনিয়ন) হয়। সে সময় এর সদস্য ছিল ১৫টি। সমগ্র ইউরোপীয় কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করার পদক্ষেপ হিসেবে EU কে ব্যাপক সম্প্রসারণ করার প্রক্রিয়া হিসেবে ২০০৪ সালের মে মাসে EU তে আরও ১০টি দেশ যোগ দিলে EU এর সদস্য দাঁড়ায় ২৫ এ। ১ জানুয়ারি ২০০৭ সালে বুলগেরিয়া ও রোমানিয়া দুটি দেশ যোগ দিলে সদস্য হয় ২৭ এবং ২০১৩ সালে ১ জুলাই ক্রোয়েশিয়া ২৮তম দেশ হিসেবে EU তে যোগ দেয়। ২০২০ সালের ৩১ জানুয়ারি যুক্তরাজ্য ব্রেক্সিটের মাধ্যমে EU ত্যাগ করায় এর সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ২৭টি।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)

ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিসমূহ

- **রোম চুক্তি :** ১৯৫৭ সালের ২৫ মার্চ পশ্চিম ইউরোপের ৬টি দেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা 'রোম চুক্তি' (Rome Treaty) নামে পরিচিত। চুক্তি অনুযায়ী ১৯৫৮ সালের ১ জানুয়ারি European Economic Community (EEC) বা European Community (EC) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চুক্তির ফলে ইউরোপীয় কয়লা ও ইস্পাত সম্প্রদায় বা ECSC এর কর্মপরিধি বর্ধিত হয় এবং বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইতালি, পশ্চিম জার্মানি, লুক্সেমবার্গ ও নেদারল্যান্ডের সমন্বয়ে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায় (European Economic Community) গঠিত হয়।

- **ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি :** ১৯৯২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি নেদারল্যান্ডের ম্যাসট্রিক্ট শহরে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা ম্যাসট্রিক্ট (Maastricht Treaty) চুক্তি নামে পরিচিত। ১ নভেম্বর, ১৯৯৩ সালে এই চুক্তি কার্যকর হয় যার ফলে European Community (EC) পরিবর্তিত হয়ে 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন' গঠিত হয়।

- **লিসবন চুক্তি :** ২০০৯ সালের ১ ডিসেম্বর কার্যকর হওয়া লিসবন চুক্তিকে বলা হয় EU এর অন্যতম সাংবিধানিক ভিত্তি। এর Article 50-এ জোট থেকে বের হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)

ব্রেক্সিট (BREXIT)

Brexit হলো Britain Exit এর সংক্ষিপ্ত রূপ। চার দশকের সম্পর্ক ছিন্ন করে ২৮ জাতির অর্থনৈতিক জোট ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) থেকে বের হয়ে নতুন পথে হাঁটার প্রশ্নে যুক্তরাজ্যের গৃহীত গণভোটের ফলাফলকে বাস্তবায়িত করার পদক্ষেপকে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সংক্ষেপে Brexit নামে অভিহিত করে। EU গঠনের পর বৃটেনই সংস্থাটির প্রথম দেশ, যারা এ জোট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ২৩ জুন, ২০১৬ তারিখে ব্রেক্সিট প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি জটিল ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ও ৩ জন প্রধানমন্ত্রীর হাত ঘুরে ৩১ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে ব্রেক্সিট কার্যকর হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের লিসবন চুক্তির ৫০ ধারা অনুযায়ী কোনো সদস্য দেশ গণভোটের মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগ করতে পারে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)

ব্রেক্সিট এর প্রেক্ষাপট

- **ব্রিটিশদের স্বাধীনচেতা ঐতিহ্য:** বৃটেনের অধিকাংশ নাগরিক তাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর কারো হস্তক্ষেপ চান না। EU-এর সদস্য হওয়ায় বৃটেনকে তার স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সামরিক নীতিতে ছাড় দিতে হচ্ছিল কারণ EU -এ আইনকানুন সব ক্ষেত্রে বৃটেনের সমকক্ষ নয়। তাছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নে অতিমাত্রায় সম্পৃক্ততার কারণে বৃটেন তার জাতীয় ঐতিহ্য বা বৈশিষ্ট্য হারাতে চায় না বলেই এই জোট থেকে বের হয়ে যেতে চাচ্ছিল।

- **অর্থনৈতিক স্বার্থ:** EU ভুক্ত সদস্য দেশের মধ্যে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা অবশ্য অন্য সদস্য রাষ্ট্রের চেয়ে ভালো। এ কারণে এই তিনটি রাষ্ট্রের চাঁদার পরিমাণ বেশি। বৃটেনের জনগণ এই অতিরিক্ত চাঁদার বোঝা বহন করতে রাজি হচ্ছিল না। আর ব্রিটিশরা ইউরোপীয় সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করতে চায়। EU জোট ভুক্ত হয়ে থাকলে এই ব্যবসা করতে গিয়ে বেশ কিছু ব্যাপারে ছাড় দিতে হচ্ছিল যা বৃটেনের জন্য লাভজনক হচ্ছিল না।

- **পাউন্ডের অবমূল্যায়ন:** পাউন্ডের বিলুপ্তি এবং EU এর সদস্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য মুদ্রাব্যবস্থা ইউরো বৃটেনের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই তারা EU এর সদস্য হয়েও ইউরো মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করেনি। এরকম বিচ্ছিন্নতাবাদী মনমানসিকতা EU থেকে বৃটেনের সম্পর্কচ্ছেদ অবশ্যাম্ভাবী করে তুলছিল।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)

- **ভিবাসীর চাপ ও কর্মসংস্থানের সংকট:** ‘শেনজেন’ চুক্তির কারণে EU ভুক্ত ২৭টি দেশের নাগরিক ভিসা ছাড়াই এক দেশ থেকে আরেক দেশে প্রবেশ করতে পারে। বৃটেনে বার্ষিক নেট মাইগ্রেশনের হার প্রায় ৩৩ লাখ। এর অর্ধেকেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো থেকে আসে। এই অবাধ অভিবাসন কার্যতই বৃটেনের জনগণ পছন্দ করছিল না। আর বৃটেন EU তে থাকলে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ দেশটির পক্ষে কার্যত অসম্ভব। তাছাড়া সদস্য রাষ্ট্রের জনগণের অবাধ চলাচলের কারণে যুক্তরাজ্যের কর্মসংস্থানের চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলছে। যুক্তরাজ্যের জীবন যাপনের মান অন্যান্য সদস্য দেশ থেকে উন্নত হওয়ায় পূর্ব ইউরোপ থেকে অনেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করে কর্মসংস্থান সমস্যা তৈরি করছে। এই সংকট নিরসনেও বৃটেনের জন্য EU থেকে বের হয়ে আসা জরুরি হয়ে পড়ে।

- **বিভিন্ন চুক্তিতে বৃটেনের স্বাক্ষর না করা:** ইউরোপীয় দেশগুলোর মাঝে ভিসামুক্ত যাতায়াতের জন্য ১৯৮৫ সালের শেনজেন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি বৃটেন। ১৯৯২ সালে নেদারল্যান্ডসে স্বাক্ষরিত ম্যাসট্রিক্ট চুক্তির মাধ্যমে European Community থেকে European Union প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইউরো মুদ্রা চালু হয়। বৃটেন এই চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেনি। এছাড়াও ১৯৮৬ সালের ইউরোপীয় পার্লামেন্টের মুক্ত বাণিজ্য আইন চুক্তি, ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউরো মুদ্রা গ্রহণকারী দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জোট ECB ইত্যাদি কার্যক্রমেও বৃটেন অংশগ্রহণ করেনি। EU এর এ ধরনের বিভিন্ন চুক্তি ও উদ্যোগ থেকে পূর্ব থেকেই দূরে থাকা বৃটেনের EU থেকে বের হয়ে আসা শুধুই সময়ের ব্যাপার ছিল।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)

- **শরণার্থী বিষয়ক তুর্কিয়ের সাথে চুক্তি:** ২০১৫ ও ২০১৬ সালে EU এবং তুর্কিয়ে শরণার্থী বিষয়ক ২টি চুক্তি স্বাক্ষর করে। প্রথম চুক্তিতে বলা হয়, তুর্কিয়ে যে পরিমাণ শরণার্থীর আশ্রয় দিবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তত জন তুর্কি নাগরিককে ইউরোপে অভিবাসীর মর্যাদা দিবে। দ্বিতীয় চুক্তিতে বলা হয়, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৮টি সদস্য দেশ আনুপাতিক হারে ১২ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দিবে। বৃটেন এসব চুক্তির বিরোধিতা করে। তাদের দাবি, বৃটেন যেহেতু শেনজেন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি, সেহেতু বৃটেন এই শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে বাধ্য নয়। উল্টো বৃটেন এই চুক্তি বাতিলের দাবি জানিয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল বলেন, "বৃটেন যদি শরণার্থী ইস্যুতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগ করতে চায়, তাহলে জার্মানি আপত্তি করবে না"। মার্কেলের এই বক্তব্যকে বৃটেন মানহানিকর মনে করে এবং EU থেকে বের হয়ে যেতে উস্কে দেয়।

OPEC এবং OPEC PLUS

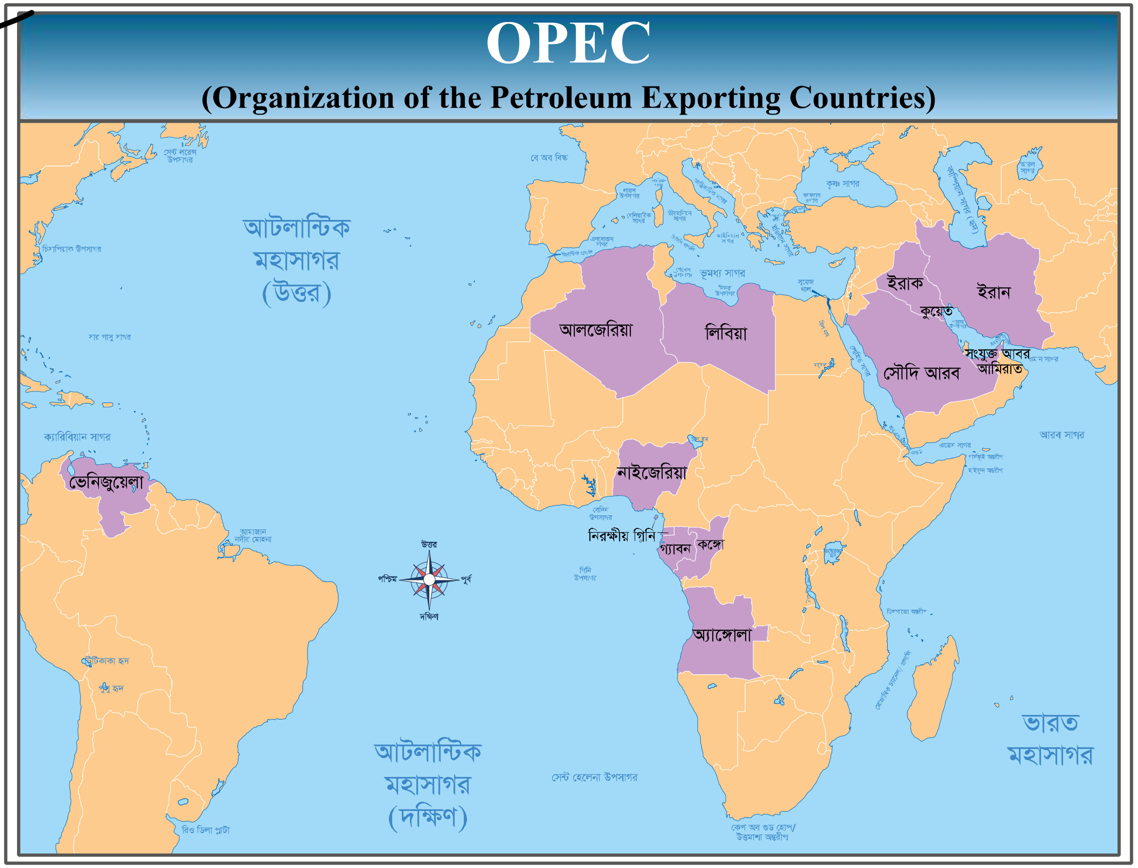

OPEC PLUS

OPEC ভুক্ত ১৩টি রাষ্ট্র ছাড়াও বেশ কিছু রাষ্ট্র রয়েছে যারা তেল উৎপাদন ও বাণিজ্য করে। NON-OPEC-ভুক্ত রাষ্ট্রের মধ্যে রয়েছে রাশিয়া, আজারবাইজান, কাজাখস্তান, ব্রুনাই, ওমান, মালয়েশিয়া ইত্যাদি। OPEC ভুক্ত ১৩টি দেশ ও NON OPEC ভুক্ত দেশের সমন্বয়ে গঠিত জোট হলো OPEC PLUS । ২০১৬ সালে এই জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

OPEC এবং OPEC PLUS

বিশ্ব ব্যবস্থায় OPEC PLUS এর সিদ্ধান্তের প্রভাব

- **সৌদি যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের নতুন মাত্রা:** যুক্তরাষ্ট্র সৌদিকে আধুনিক সমরাস্ত্র হতে শুরু করে উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করে থাকে। সৌদির নিরাপত্তা বিধানে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও OPEC PLUS এর এই সিদ্ধান্ত দুই দেশের সম্পর্কে সংকট তৈরি করেছে। যুক্তরাষ্ট্র সৌদিকে দেওয়া সকল প্রতিশ্রুতি বাতিলের হুমকি দিয়েছে। ইতোমধ্যে সৌদি ইরান সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটেছে। এটিও যুক্তরাষ্ট্রের কপালে ভাঁজ সৃষ্টি করেছে।

- **ইউরোপীয় ইউনিয়ন/দেশসমূহে প্রভাব:** শীত প্রধান ইউরোপীয় দেশসমূহে OPEC PLUS এর এই সিদ্ধান্ত নতুন সংকটের জন্ম দিবে। এমনিতেই জ্বালানি সংকটে ভুগছে ইউরোপ। OPEC PLUS এর এমন সিদ্ধান্তে ইউরোপে জ্বালানি তেলের দাম দ্বিগুণ হওয়ার আশঙ্কা করছে বিশেষজ্ঞরা। এর ফলে ইউরোপ তার কৌশলগত সুবিধা হারাবে এবং এটি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে কৌশলগত সুবিধা দিবে।

- **রাশিয়ার স্বার্থের অনুকূল:** রাশিয়া ইউরোপের ৪০% জ্বালানি সরবরাহ করে। OPEC PLUS এর সিদ্ধান্তকে রাশিয়া স্বাগত জানিয়েছে। পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞার কারণে রাশিয়ার অর্থনীতি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। কিন্তু OPEC PLUS এর এই সিদ্ধান্ত রাশিয়ার অনুকূলে যাবে। এ অবস্থায় জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি পাবে এবং উচ্চমূল্যে জ্বালানি সরবরাহ করে রাশিয়া তার ক্ষতি অনেকটা পুষিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

OPEC এবং OPEC PLUS

- **মন্দা পরিস্থিতি ত্বরান্বিত:** বিশ্বব্যাংক আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছে যে, ২০২৩ সাল হতে বিশ্বব্যাপী মন্দা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মতে OPEC PLUS এর সিদ্ধান্ত সেই মন্দাকে ত্বরান্বিত করবে। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির জের ধরে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাবে, দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি পাবে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতা তৈরি হবে।

OPEC PLUS এর সিদ্ধান্তের কারণে যুক্তরাষ্ট্র-সৌদি সমীকরণ জটিল আকার ধারণ করেছে। সৌদির উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার হুমকিও প্রদান করেছে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু বাস্তবে সৌদি যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের রসায়ন আরো জটিল। মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করার জন্য সৌদির প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্রকে। আবার ইরানকে মোকাবেলা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন সৌদি আরবকে। অন্যদিকে চীনের মধ্যস্ততায় সৌদি ইরান সম্পর্কের নতুন দ্বার উন্মোচন হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সৌহার্দ্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থা

❖ মহামারি যেভাবে বদলে দিয়েছে বিশ্বকে

প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস বর্তমানে বিস্তার লাভ করেছে পৃথিবীর সব দেশে। মহামারির ছোবলে পৃথিবীতে মারা গেছে লাখ লাখ মানুষ। বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বিশ্ব অর্থনীতি। বিশ্বের অর্থনৈতিক পরাশক্তি দেশগুলোর কাছে করোনা ভাইরাসের মহামারি হয়ে উঠেছে বর্তমান বিশ্বরাজনীতির অন্যতম নিয়ামক। করোনার উৎস, সংক্রমণের প্রসার ও প্রতিরোধ এবং ব্যাপক প্রাণহানির প্রেক্ষাপট নিয়ে পরাশক্তিগুলোর মধ্যে তৈরী হয়েছে ঠাণ্ডা যুদ্ধ পরিস্থিতি।

মার্কিন ভাষাতত্ত্ববিদ নোয়াম চমস্কি এ অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন "Nothing was done. The crisis was then made worse by treachery of the political system. That didn't pay attention to the information that they were aware of" অর্থাৎ রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধির ফেরে করা হয়নি কিছুই নইলে কমানো যেত করোনার ক্ষয়ক্ষতি।

➲ **করোনাকালীন সময়ে বিশ্বব্যবস্থার অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্রগুলোতেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।** যেমন:

১. **অর্থনৈতিক পরিবর্তন:** করোনার কারণে অর্থনীতিতে নেমেছে মারাত্মক ধ্বস। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা IMF এর মধ্যেই হুশিয়ারি দিয়েছে যে, ১৯৩০ সালের বৈশ্বিক মহামন্দার পর এমন খারাপ অবস্থায় বিশ্ব অর্থনীতি আর পড়েনি। IMF এর মতে, মহামারির প্রকোপে **বিশ্ব অর্থনীতি সংকুচিত হবে ২ থেকে ৩ শতাংশ**। আবার যদি মহামারি দীর্ঘায়িত হয়, বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো পড়বে অগ্নিপরীক্ষার মুখে। সেক্ষেত্রে বিশ্ব অর্থনীতির চাকা সচল করতে পারি দিতে হবে সুদীর্ঘ পথ।

কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থা

ক. বৈশ্বিক শেয়ারের পরিবর্তন: করোনার মহামারির কারণে স্টক মার্কেটে বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। যেখানে সংস্থাগুলির শেয়ার কেনা-বেচা হয়, সেসব পেনশন বা স্বতন্ত্র সঞ্চয়ী অ্যাকাউন্টগুলোর মূল্য প্রভাবিত হয়েছে। কোভিড ১৯ সংকটের প্রথম দিকে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান সংস্থা যেমন এফটিএসই, Dow Jones Industrial Average এবং NIKKEI সকলেই তাদের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বিশাল পতন দেখতে পায়। প্রথম ভ্যাকসিন ঘোষণার পর পর এশীয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান স্টকমার্কেট তাদের অবস্থা কিছুটা উন্নত করতে সমর্থ হয়। তবে বেশ কিছু কোম্পানির শেয়ার এখনো উর্ধ্বগতির মুখ দেখেনি।

খ. বেকারত্ব বৃদ্ধি: মহামারির প্রকোপে অনেক লোক চাকরি হারিয়েছে এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়নি যার ফলে বেকারত্বের হার বেড়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর মতে যুক্তরাষ্ট্রে কাজের বাইরে থাকা মানুষের অনুপাত বাৎসরিক মোট **৮.৯%,** যা আগামি এক দশকের জন্য নতুন চাকরির সম্ভাবনার শেষের দিকে ইঙ্গিত দেয়। পর্যটন শিল্পের মতো অর্থনীতির ক্ষেত্রগুলো প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে। নতুন কাজের সুযোগের সংখ্যা এখনও অনেক দেশে খুব কম।

গ. পণ্যমূল্য বৃদ্ধি: করোনাকালীন প্রকোপের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলো গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে কিছুটা স্বনির্ভর হয়েছে। এদিকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা জনিত কারণে বিভিন্ন দেশে পণ্য চলাচলে বাধা অনেক বেড়েছে। আবার যানবাহন থেকে হোটেল ব্যবসাসহ সব ক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে ফলে পণ্যের দাম আগের চেয়ে বাড়বে।

ঘ. ই-কমার্সের উত্থান: লকডাউনের কারণে বেশিরভাগ ক্রেতা ও বিক্রেতা ঘরে বসে থাকায় কমে গেছে খুচরা ব্যবসা। ভাইরাসের নতুন নতুন ধরন এই পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। Accountancy Giant EY জানায় যে ৬৭% গ্রাহকরা এখন কেনাকাটার জন্য ৫ কিলোমিটারের বেশি ভ্রমণ করতে আগ্রহ হারাচ্ছেন। কেনা- কাটার এই পরিবর্তনের কারণে ২০২০ সালে ৩৯ ট্রিলিয়ন ডলার বিশ্বব্যাপী আয়সহ অনলাইন বাজার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সুযোগে ই-কমার্সে সাধিত হয়েছে বিপ্লব।

কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থা

২. **পর্যটন শিল্পে পরিবর্তন:** পর্যটন ব্যবসা ব্যাপক মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গ্রাহকরা ব্যবসায়িক ও অবকাশজনিত ভ্রমণ বাতিল করায় পর্যটন শিল্পের গতি হ্রাস পেয়েছে। ফ্লাইট ট্র্যাকিং পরিষেবা "ফ্লাইটরাডার 24" এর তথ্যানুসারে বিশ্বজুড়ে বিমান চলাচল খাতে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার করা চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাড়িয়েছে। ২০২০ সালে ইতোমধ্যে বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে যদিও ২০২১ সালের অবস্থা কিছুটা ভালো, অনেক বিশ্লেষক মনে করেন যে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ এবং পর্যটন ২০২৫ সালের মধ্যে প্রাক-মহামারি পর্যায়ে ফিরে আসবে না।

৩. **শিক্ষা ও ক্রীড়া ব্যবস্থায় পরিবর্তন:** করোনা ভাইরাসের প্রকোপে চলমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এসেছে বিপুল পরিবর্তন। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রম সম্পূর্ণ হয়ে গেছে অনলাইনভিত্তিক। ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলোও মুখোমুখি হয়েছে রূঢ় বাস্তবতার। বিশ্বের অনেক বড় বড় ক্রীড়া অনুষ্ঠান ইতোমধ্যে বাতিল করা হয়েছে।

৪. **জীবন যাপনের ধরন পরিবর্তন:** করোনা মহামারির প্রকোপে বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবন যাপনের ধরনে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। মানুষ বুঝতে পেরেছে "Prevention is better than Cure" ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দিকে অবধারিতভাবে গুরুত্ব বেড়েছে। করোনা পরবর্তী সময়ে অর্গানিক ফুডের বাজার চাঙা হয়ে উঠছে। বিশেষ করে যেসব খাবার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, সেগুলোর দিকে মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। ফলে ভোগের ধরন পরিবর্তন হয়েছে। সাথে পাল্টিয়েছে জীবন যাপনের ধরনও।

৫. **কট্টর জাতীয়তাবাদের উত্থান:** করোনা বিশ্বায়ন ধারণাকে নতুন এক চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে। করোনা দেখিয়েছে, এত দিনকার বিশ্বায়ন টেকসই নয়। এই বিশ্বায়নের কেন্দ্রে ছিল বাণিজ্যিক স্বার্থ, রাজনৈতিক যোগ্যতা নয়। করোনা বিশ্বায়নের অন্ধকার অংশে আলো ফেলে দিয়েছে। করোনার সংক্রমণে রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ সীমান্ত নিয়ে সচেতন হয়েছে। খোদ ইউরোপীয়ান ইউনিয়নও এককভাবে এবার কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। বরং ইউনিয়নভুক্তরা একে অপরের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধ করার চেষ্টায় ছিল কঠোরভাবে। ইতিমধ্যে এই প্রবণতাকে করোনা জাতীয়তাবাদ বলা শুরু হয়েছে।

কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থা

৬. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা ও ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থার উত্থান

- করোনা আমাদেরকে দেখিয়েছে যে, অস্ত্র ব্যবসায় সফল হওয়ার থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো বেশি জরুরি। ফলে টিকা বাণিজ্য বিশ্ব অর্থনীতিতে পালন করবে এক বড় নিয়ামকের ভূমিকা। বায়োটেক গবেষণা বেড়েছে। তবে বায়াটেক গবেষণা এবং এ থেকে উৎপাদিত পণ্যের বিপণনে কিউবার মতো দেশগুলো চেঞ্জ মেকার হয়ে যেতে পারে।

- যুক্তরাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে কিউবার ওপর অবরোধ প্রত্যাহার করে নিজের এক দিনকার অবস্থান সংশোধন করতে পারে। সাধারণভাবে বড় বড় ওষুধ কোম্পানির জন্য আগামী দিনগুলো আশাবাদী হওয়ার মতো। তবে অনলাইনে চিকিৎসকদের মতামত নেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। বিজ্ঞানের জগতে বংশগতিবিদ্যা, জীববিদ্যা, সংক্রামক রোগ নিয়ে পড়ালেখার গুরুত্ব বেড়েছে।

- নার্সিং ও বয়স্কদের স্বাস্থ্যসেবায় অধিক বিনিয়োগ বাড়ানোও এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। ভোটের হিসেবে বিশ্বব্যাপী সিনিয়র সিটিজেনরাই বেশি, ফলে এ ক্ষেত্রে সম্পদ স্থানান্তর ঘটবে বলেই মনে হয়।

- বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের সরকার কোভিড ১৯ ভ্যাকসিন এবং চিকিৎসা বিকল্পের জন্য কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ফলে ভ্যাকসিন বিকাশের সাথে জড়িত কিছু ওষুধ সংস্থার শেয়ার বেড়েছে। Moderna, Novavax এবং অ্যাস্ট্রাজেনেকা (AstraZeneca) কোম্পানির শেয়ারে উল্লেখযোগ্য উত্থান দেখা গেছে।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- সুইডেন ও ফিনল্যান্ড ন্যাটোতে যোগ দিলে তা বিশ্বের শক্তি-ভারসাম্যকে কীভাবে প্রভাবিত করবে বিশ্লেষণ করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে সার্কের বর্তমান অবস্থা কী? ভবিষ্যতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার জন্য সার্কের (Charter) চার্টার-এ পরিবর্তন আনা কি প্রয়োজন? কী ধরনের পরিবর্তন সার্কের ভূমিকাকে কার্যকরী করবে? মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে আসিয়ান (ASEAN) কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- APEC কী? এ সংস্থাটি কত সালে, কাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়? [৩৪তম ও ২০তম বিসিএস লিখিত]
- APEC এর মূল তিনটি কর্ম ক্ষেত্রসম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৩৪তম বিসিএস লিখিত]
- APEC কর্তৃক অনুসারিত নীতিমালা গুলো সদস্য দেশ গুলোর জন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি করেছে কি? পয়েন্ট আকারে লিখুন। [৩৪তম বিসিএস লিখিত]

BCS কঠিন নয়; প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়